Registration No.: SO197407 of 2012-2013

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

ত্রয়োদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ৩❖সেপ্টেম্বর ২০২৩

ঃ সম্পাদকীয় ঃ

চাঁদের বুকে চন্দ্রায়ন ৩-এর সফল অবতরণ – বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত

ঃ বিশেষ রচনা ঃ

■ প্রতিবেশী

■ পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব রহস্য

ঃ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান (ষষ্ঠ পর্ব) ঃ

কৃষিতে সার, কীটনাশক প্রয়োগ-পরিবেশে প্রভাব ও প্রতিকার

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিশেষ রচনা ঃ ৬
◆প্রতিবেশী
◆পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব রহস্য

◈ চয়ন ঃ ১৩
◆ভারত কেন স্কুলের বিজ্ঞান পাঠক্রম থেকে বিবর্তন এবং পর্যায় সারণী বাদ দিচ্ছে?

◈ চিঠিপত্র ১৪

◈ অতিথি কলম ঃ ১৫
◆আলোর গতির মান নির্ণয়ের ইতিহাস
◆চোখ – আমাদের মনের জানালা

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান (ষষ্ঠ পর্ব) ঃ ১৮
◆কৃষিতে সার, কীটনাশক প্রয়োগ-পরিবেশে প্রভাব ও প্রতিকার

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ২৩
◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ সমীক্ষা ঃ ২৭
◆১. ভারতের তৃতীয় চন্দ্রাভিযান প্রসঙ্গে জনমত
◆২. উত্তরবঙ্গে মদ কারখানা থেকে এলাকায় দূষণ ...

◈ রিপোর্ট ঃ ৩০
◆বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতে অগ্রগতি
◆বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে শিশুদের ভাবনা

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ৩৩
◆একটি শিশু মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন

◈ বিজ্ঞানের খবর ৩৪

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৪

◈ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের অগ্রগতি ৩৭

◈ কবিতা ঃ ৩৯
◆ব্যঞ্জনবর্ণের ছড়া

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ

১. ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও’র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী থমাস হ্যারিয়ট-এর আঁকা চাঁদের ছবি।

২. চাঁদের মাটিতে রোভার প্রজ্ঞান থেকে তোলা ল্যান্ডার বিক্রম-এর ছবি।

সম্পাদকীয় ঃ

চাঁদের বুকে চন্দ্রায়ন ৩-এর সফল অবতরণ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত

বিজ্ঞানীদের নিপুণ গবেষণা অনুসারে উৎক্ষেপণের ৪০ দিন পর গত ২৩শে অগাস্ট ২০২৩, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদে সফলভাবে অবতরণ করল চন্দ্রযান ৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের পর চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারত থেকে উৎক্ষেপিত মহাকাশ যান চাঁদের দক্ষিণমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে এই প্রথম অবতরণ করল।

মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকে মহাকাশ নিয়ে মানুষের কল্পনার শেষ নেই। জিজ্ঞাসারাও সীমা পরিসীমা নেই। মানব সভ্যতার ঊষা লগ্নের মাথার উপরের সেই নীল আচ্ছাদনটা, সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে সীমাহীন ক্রম প্রসারমান মহাকাশে পরিণত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের জগতে মহাকাশ বিজ্ঞান বোধহয় মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়। রাতের অন্ধকারে আকাশের গায়ে ফুটে থাকা অযুত নিযুত আলোক কণার সম্ভার আমাদের অভিভূত করে। উস্কে দেয় আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে। আর আমাদের গ্রহের নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী চাঁদ? তাকে নিয়ে তো মানুষের আবেগের শেষ নেই। কত গল্প, কত কবিতা, কত রচনা সৃষ্টি হয়েছে চাঁদকে নিয়ে তার হিসেব কেউ রাখেনি। শৈশবে মাতৃক্রোড়ে শুয়ে মায়ের মুখে ‘আয় আয় চাঁদা মামা’ বা ‘চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা’ একথা শোনেনি এমন শিশু আছে নাকি! আর এইভাবেই সর্বজনীন চাঁদমামা’র সঙ্গে আমাদের গড়ে উঠেছে এক নিবিড় সম্পর্ক।

দীর্ঘদিনের লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞান সাধকের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল এই চন্দ্রাভিযান। সমাজ বিকাশের অগ্রগতি ও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সোপানে চড়ে মানুষ পৌঁছে গিয়েছিল চাঁদের মাটিতে।

ভারতের শাসকশ্রেণী এই বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে “বিকশিত ভারতের শঙ্খনাদ, নতুন ভারতের জয়ঘোষ” রূপে বর্ণনা করে উগ্রজাতীয়তাবাদ তথা হিন্দুত্ববাদের প্রচার করে চলেছে অবতরণস্থলকে শিবশক্তি নাম দিয়ে। এই প্রসঙ্গে বিভ্রম কাটাতে চন্দ্রায়ন-৩ এর সাফল্যের প্রেক্ষাপট সামনে এনে প্রকৃত সত্য হাজির করা দরকার।

এটা মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিস্কার

চন্দ্রাভিযানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ল্যান্স লিপারসে আবিষ্কার করেন দূরবীন। সেটাই ছিল মানুষের মহাকাশ চর্চায় হাতে খড়ি। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সর্বপ্রথম দূরবীনের সাহায্যে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং থমাস হ্যারিওটের সাহায্যে চাঁদের ছবি আঁকেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল ফ্লোরেন্ট ভ্যান ল্যাঙ্গেন চাঁদের মানচিত্র তৈরি করেন। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে গিওভ্যানি বাতিস্তা বিভিন্ন দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নামানুসারে চাঁদের গিরিখাতগুলি নামকরণ করেন। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রজার জোসেফ বস্কোভিচ তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করেন চাঁদে কোনও বায়ুমন্ডল নেই। যদিও অনেক পরে প্রমাণিত হয় যে চাঁদে অতি হাল্কা স্তরের বায়ুমন্ডল উপস্থিত। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক ১ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে যা মাহাকাশ থেকে সিগন্যাল পাঠাতে সক্ষম হয়। ওইবছরই স্পুটনিক ২ মহাকাশে প্রথম প্রাণী লাইকা নামে একটি কুকুরকে পাঠায়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন মহাকাশযান 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট' নামক মহাকাশে অবস্থিত একটি স্তরকে চিহ্নিত করে যার বিকিরণের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে লুনা ১ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করে সৌর ঝড়ের উপস্থিতি প্রমাণ করে। ওই বছরই মহাকাশযান লুনা ২ চাঁদের পৌঁছায় এবং অটোলাইকাস গিরিখাতের কাছে আছড়ে পড়ে। এক্সপ্লোরার ৬ পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর ছবি পাঠায়। লুনা ৩ চাঁদের উল্টোদিকের ছবি পাঠায়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা 'হ্যাম' নামক এক শিম্পাঞ্জিকে মহাকাশে পাঠায়। ওই বছরই সোভিয়েত মহাকাশযান ভস্তক ১-এ চড়ে প্রথম মানুষ ইউরি গ্যাগারিন পৃথিবীর কক্ষপথ আবর্তন করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহিলা সোভিয়েত নভোশ্চর ভ্যালান্তিনা তেরোস্কোভা মহাকাশে গমন করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-৯ চাঁদের মাটিতে সফলভাবে অবতরণ করে ও চাঁদের অজস্র ছবি পাঠায়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-৮ তিনজন নভোশ্চরকে নিয়ে চাঁদের মাটিতে অবতরণের চূড়ান্ত মহড়া দেয় এবং ওই বছরের ১৬ই জুলাই তিনজন মার্কিন নভোশ্চরকে নিয়ে অ্যাপোলো-১১ চাঁদে অবতরণের জন্য পারি দেয় এবং ২১শে জুলাই চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করে এবং চন্দ্রাভিযান সম্পন্ন করে ২৪শে জুলাই পৃথিবীতে ফিরে আসে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-১৬ চাঁদে অবতরণ করে এবং রোবোটের সাহায্যে চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-২০ পুনরায় চাঁদের টেরা অ্যাপোলোনিয়াস পর্বতের কাছে সফলভাবে অবতরণ করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-১৭ চাঁদে অবতরণ করে শেষবারের মত লুনার রোভিং ভেহিকেল ব্যবহার করে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের অগাস্টে সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-২৪ চাঁদে অবতরণ করে সাড়ে ৯৬ ঘন্টা চাঁদে ভ্রমণ করে ১৭০.১ গ্রাম চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ চন্দ্রাভিযান। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো প্রথম চন্দ্রযান চন্দ্রায়ন-১ মহাকাশে প্রেরণ করে এবং ৩১২ দিন মহাকাশে ভ্রমণ করে চাঁদের মাটিতে বরফের উপস্থিতি প্রমাণ করে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে চিনের মহাকাশযান চ্যাং-১ সফলভাবে প্রথমবার চাঁদে অবতরণ করে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর চিনের চ্যাং-৪ পৃথিবী থেকে রওনা দিয়ে ৩রা জানুয়ারি ২০০৯ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর নিকটস্থিত পোল-এইটকেন বেসিন অঞ্চলে সফলভাবে অবতরণ করে। এই চন্দ্রযান চাঁদের মাটি থেকে নিকস্থ পর্বতের উচ্চতা মাপে যার পরিমাণ ১৫ কি.মি. (মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার প্রায় দ্বিগুণ)। বিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলে তুলা, আলু, রেপসিড এবং একটি ফুলদায়ী গাছ (আরাবিডোপসিস) চাঁদের মাটিতে বপণ করে অঙ্কুরোদগম হয় কিনা তার পরীক্ষা করেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রায়ণ-২ চাঁদে পৌঁছেও সফলভাবে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে চিনের মহাকাশযান চ্যাং-৫ চাঁদে অবতরণ করে ১.৭৩১ কি. গ্রা চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে আনে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অগাস্ট ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রায়ন-৩ সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে সফলভাবে অবতরণ করে এবং অবতরক (ল্যান্ডার) প্রজ্ঞান এবং রোবটীয় গাড়ি (রোভার) বিক্রম চাঁদের প্রকৃতি অনুসন্ধান করে পৃথিবীতে তথ্য পাঠিয়ে চলেছে।

কোনকালেই জাতীয় বিষয় ছিল না। তাই গ্যালিলিও, নিউটন, ফ্যারাডে, আইনস্টাইন, ডারউইন বা সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র আবিষ্কারকে কেউ ইতালীয়, বৃটিশ, জার্মান বা ভারতীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন না। আর বর্তমান যুগের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিস্কার সব অর্থেই আন্তর্জাতিক। এক একটি প্রকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার বিজ্ঞানী একসাথে কাজ করেন। মহাকাশ গবেষণা তো সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক। ১৪ই জুলাই ২০২৩, চন্দ্রায়ন-৩ এর উৎক্ষেপণের অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর পাশে আছে। ইসরো-ও তেমনই বিশ্বের অন্য প্রান্তের গবেষণার পাশে আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) এবং ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সী (ইএসএ) ক্রমাগত ইসরোকে চন্দ্রায়ন-৩ এর সফল অবতরণে ভূমিগত সাহায্য করেছে ধারাবাহিকভাবে। কারণ মহাকাশ অভিযানে বিশেষত অবতরণের প্রশ্নে 'ব্যাক আপ' সহযোগিতার দরকার হয়। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের কোন এক স্থান থেকে মহাকাশ যানের প্রতি মুহূর্তের অবস্থান নির্ণয় করা, নজরদারী করা এবং সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোন একটি সংস্থার পক্ষে বিশ্ব জুড়ে দীর্ঘ অ্যান্টেনা ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ। চন্দ্রায়ন-৩ অভিযানে ইএসএ সংযুক্ত রাজ্যস্থিত

গুণহিলি ও ফ্রেঞ্চ গায়ানাস্থিত কোরো আর্থ যথাক্রমে ৩২ মিটার ও ১৫ মিটার অ্যান্টেনার সাহায্যে ক্রমাগত যানটির উপর নজরদারি চালিয়েছে; টেলিমেট্রি তথ্য সংগ্রহ করে ইসরোর ব্যাঙ্গালোর স্থিত মিশন অপারেশন কেন্দ্রের নির্দেশে চন্দ্রায়ন-২ এ প্রেরণ করেছে। এমনকি চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণের প্রয়াসকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করতে অস্ট্রেলিয়ার নিউ নর্সিয়ার ডিপ স্পেস অ্যান্টেনা নিয়োজিত ছিল। অবতরণের ঠিক আগের মুহূর্তে ব্যাঙ্গালোর ইসরো কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত ধারাবিবরণী দেখে সমগ্র ভারতবাসী যখন আপ্লুত তখন আমাদের জানানো হয়নি যে ল্যান্ডার বিক্রমের বাস্তব সময়ভিত্তিক স্বাস্থ্য-অবস্থান-অবতরণ পথ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহে ইএসএ-র ঐ স্পেস অ্যান্টেনা যুক্ত। নাসা-র ডিপ স্পেস নেটওর্য়ক (ডিএসএন) চূড়ান্ত মুহূর্তে ক্যানবেরা ও মাদ্রিদস্থিত ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন কমপ্লেক্স থেকে একই সহযোগিতা করেছে। একইভাবে এখন সূর্যাভিমুখী আদিত্য এল-১ এর গতিপথে সাহায্য করে চলেছে ঐ সংস্থাগুলি। তাই চন্দ্রায়ন-৩ এর সাফল্যলাভের একমাত্র দাবিদার ভারতের অসংখ্য বিজ্ঞানী তথা বিজ্ঞান সংস্থা ইসরো এবং বর্তমান সরকারই এই প্রপাগান্ডার কণামাত্র সত্যতা নেই।

বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিস্কার সমূহ পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা কামানোর হাতিয়ার মাত্র। তাই এখন মহাকাশ বিজ্ঞান পুঁজিপতিশ্রেণীর ভাষায় মহাকাশ শিল্প-মহাকাশ বাণিজ্য (স্পেস ইন্ডাস্ট্রি – স্পেস বিজনেস)। বলা হচ্ছে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এই মহাকাশ শিল্পের আয়তন হল ৫৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি, ১ হলার = ৮০ টাকা)। ২০২৫ এ ভারতে এর সম্ভাব্য আয়তন দাঁড়াবে ১৩ বিলিয়ন ডলার। আর্থিক খরচ বাঁচাতে বিশ্বে ইসরো এখন অগ্রণী। নাসার মঙ্গলযান কিউরিওসিটি প্রকল্পে খরচ হয়েছে ২০,৬৩৭ কোটি টাকা। সেখানে চন্দ্রায়ন-১-এ খরচ হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা, চন্দ্রায়ন-২ এ ৯৭৮ কোটি টাকা এবং চন্দ্রায়ন-৩ এ মাত্র ৬১৫ কোটি টাকা। সস্তায় উৎক্ষেপণের ক্ষমতার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রকেট ও উপগ্রহ উৎক্ষেপণে ইসরো তাই ক্রমান্বয় বরাত পাচ্ছে। সম্প্রতি ইসরোর বিজ্ঞানী নাম্বি নারায়ণম ইন্ডিয়া টুডে'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন "শুধু চন্দ্রায়ন মিশন নয়, আমার একটা ছোট স্বপ্ন আছে যা আমি ভাগ করে নিতে চাই এই উপলক্ষ্যে। ইউএসএ-তে যেমন নাসা (NASA), ইউরোপিয়ানদের যেমন আছে ইসা (ISSA) তেমনই আমি চাই এশিয়ান স্পেস এজেন্সি (ASA) এই অঞ্চলের জন্য। যার অর্থ আগামী দিনে এই সকল ব্যয়বহুল স্পেস মিশনকে পরিচালনা করা যাবে। ... অনেক ছোট ছোট দেশ যেমন শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড সহ উপসাগরীয় দেশগুলি এতে যোগ দিতে পারে এবং এমনকি জাপানও এতে যুক্ত হবে যদি উদ্যোগ নেওয়া যায়। আমি মনে করি এটাই উপযুক্ত সময় এমন উদ্যোগ নেবার।"

স্পেস ইন্ডাস্ট্রি ও স্পেস বিজনেসে বড় শক্তি হিসেবে ২০২১ এর জুনে রাশিয়ার রসকসমস এবং চিনের ন্যাশানাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (CNSA) আন্তর্জাতিক লুনার রিসার্চ স্টেশন (ILRS) প্রকল্প ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থা এতে যুক্ত হয়েছে ও হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, পাকিস্তান, ভেনেজুয়েলা ইতিমধ্যেই আইএলআরএস প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। ২০২৫-এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর ২০২৬-২০৩৫ চাঁদের পৃষ্ঠে সম্ভাব্য নির্মাণ কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্যবহার শুরু হবে ২০৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপও পৃথকভাবে চাঁদ এবং মহাকাশের অন্যত্র একই লক্ষ্য নিয়ে পদক্ষেপ রাখছে।

ইসরো যখন সর্বনিম্ন খরচে চন্দ্রযান পাঠিয়ে বিশ্বের দরবারে গৌরব করছে তখন চন্দ্রায়ন-৩ সাফল্যের অন্যতম কারিগরদের দুর্দশার কাহিনী সামনে আসছে। দ্য হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট "PSU engineers who build equipment for ISRO await salary" অর্থাৎ 'রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ইঞ্জিনিয়ার যারা ইসরোর জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেছে এখনও বেতন প্রত্যাশী" রচনায় দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্রায়ন-৩ এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী কারিগররা দীর্ঘ ২০ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। ঝাড়খন্ড রাজ্যে রাঁচিতে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (এইচইসি)-র ৩০০০ কর্মচারি, যাঁদের মধ্যে টেকনিশিয়ান এবং ইঞ্জিনিয়াররাও রয়েছেন, যাঁরা চন্দ্রায়ন-৩ এর যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করেছেন বিগত ২০ মাস ধরে বেতনহীন থেকে চন্দ্রায়ন-৩ এর জন্য লঞ্চিং প্যাড তৈরি করেছিলেন। যাঁদের কারিগরি শ্রম ও দক্ষতা বিক্রম ও প্রজ্ঞানকে চাঁদের মাটিতে পাড়ি জমাতে সাহায্য করেছে তাঁরা এখন বেতনহীন অবস্থায় চরম দুদর্শার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে কিছুকাল চলার পর এখন তারা ছুটির পর রাস্তায় নেমে কেউ সিঙ্গারা, কেউ গামছা, কেউ রেডিমেড পোষাক বিক্রি করছেন। পূর্ণিমা চাঁদ তাঁদের কাছে সত্যিই ঝলসানো রুটি!

প্রায় সকল ধর্মীয় বিশ্বাসে চাঁদ হল স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের বাসস্থান। বিজ্ঞানীদের শত শত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম সেই চাঁদ (এবং মহাকাশের অনেক গ্রহ-উপগ্রহ) মানবজাতির করায়ত্বে। বিজ্ঞানীরা চাঁদের সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন তথ্য

জানতে পারছেন। চাঁদের জলবায়ু, দিন-রাত্রি, মাধ্যাকর্ষণ, মাটি, পাহাড়, সমতল, খনিজ পদার্থ একে একে মানবজাতির জ্ঞানের আওতায় এসেছে। বিজ্ঞানীরা চাঁদে স্থায়ী স্পেস স্টেশন বানিয়ে ভবিষ্যতে মহাকাশের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের এবং মানবজাতির বাসস্থানের উপযুক্ত জায়গা খুঁজবে। অথচ চন্দ্রাভিযান সহ সকল মহাকাশ অভিযানের সময় বিজ্ঞান সংস্থার পরিচালকবর্গের এক বড় অংশ এমন অবৈজ্ঞানিক-অপবৈজ্ঞানিক কর্মে লিপ্ত যা বিজ্ঞান অনুরাগী কোন মানুষ মেনে নিতে পারে না। ইসরোর নির্দেশকদের একটা বড় অংশ তিরুপতি সহ বিভিন্ন মন্দিরে নারিকেল ফাটিয়ে, রকেটের প্রতিরূপ দেবতার পায়ে অর্পণ করে, যাগযজ্ঞ করে অভিযানের আগে ঐশ্বরিক কৃপা ভিক্ষা করছেন। অতীতে এই সকল কুসংস্কার স্বল্পমাত্রায় হতে দেখা যেত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতই অগ্রসর হচ্ছে, অজ্ঞতার নিরসন হচ্ছে ততই অধিক পরিমাণে সগর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ছে। রাষ্ট্র ও সরকারের দ্বারা এইসকল কুসংস্কার ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক মননের পক্ষে দাঁড়ানোর মত ঋজু মেরুদন্ড আজ অধিকাংশ চাকুরি বা পেশাজীবী বৈজ্ঞানিকদের নেই। এঁদের লক্ষ্য শাসকের কর্তাভজা আমলা বিজ্ঞানীরূপে নিজেদের কেরিয়ার ও পেশা জগতে উন্নতি। আর রাষ্ট্র চায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যতই উন্নতি ঘটুক, দেশের আপামর শ্রমজীবী সাধারণ জনতাকে কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা।

সমাজের মধ্যকার ব্যাপক আকারের অসাম্য ও বৈষম্য দেখে, সাধারণ মানুষের দুদর্শা দেখে কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বলতে শোনা যায়। দেশের মানুষের যেখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা'র সংস্থান নেই। সেখানে মহাকাশ গবেষণার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবার প্রয়োজন কি? এই টাকায় বরং গরীব মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা হোক। এই কথার জবাবে বলতে হয় নিছক ৬১৫ কোটি টাকা কেন? দেশের পুঁজিপতিরা যে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে গিয়ে মৌজমস্তি করছেন, প্রতিদিন শ্রমজীবী জনতার রক্ত-ঘাম শোষণ করে এদেশসহ সমগ্র পৃথিবীতে হাজার-লক্ষ কোটি টাকা দেশী-বিদেশী মালিকশ্রেণী আত্মসাৎ করছে তখন এই বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদে পথে নামতে দেখা যায় না কেন? কার্যত দেশের ৯৪ শতাংশ শ্রমজীবীদের শোষণ করে বিলিয়নপতি-ট্রিলিয়ানপতি হয়ে চলেছেন এই মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী। এই অসাম্য ও বৈষম্যের অবসান করতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসচেতন সংগ্রাম। প্রকৃতিকে জয় করার মানবজাতির সংগ্রাম এই অসাম্য ও বৈষম্যের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই অজানাকে জানার এবং প্রকৃতিকে জয় করার বিজ্ঞান সাধনা বন্ধ করে এই অসাম্য ও বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়। বরঞ্চ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ একদিকে উৎপাদিকা শক্তির যেমন বিকাশ ঘটায় তেমনই 'শ্রেণীবৈষম্য বিজ্ঞান গবেষণার মত সমস্ত কিছু বিকাশের বাধা' এই সামাজিক চেতনা পরিপক্ক হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমাজের সকল অংশের মানুষের মধ্যকার অন্ধকারের চেতনায় আঘাত হানে, জনতাকে বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। সুতরাং বিজ্ঞান মনস্ক, প্রগতিশীল জনতা বিজ্ঞান গবেষণা বন্ধ করার দাবি তোলে না। বিজ্ঞানের গবেষণার আরও সমৃদ্ধির দাবি জানায়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের সুফলগুলি পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে সংগ্রাম করে এবং অবশ্যই মানুষের দ্বারা মানুষের এই শোষণ ব্যবস্থায় চির অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মানবজাতির বিকাশের জন্য সংগ্রামকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। ■

সংগঠন সংবাদ ঃ

শহীদ ভগৎ সিং-এর জন্মদিন পালন

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হাওড়া জেলার পুরাষ কানপুর নটবরপাল বিদ্যামন্দিরে দুপুর ৩টায় ভগৎ সিং-এর জন্মদিন পালন করা হয়। এই দিনের আলোচনা সভায় বিষয়বস্তু রাখা হয় 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে কুসংস্কার কেন টিঁকে থাকে।' এই বিষয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখা হয়। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল হাওড়া, আমতা ইউনিট। ■

র‍্যাগিং-এ ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে প্রচার

গত ৯ই অগাস্ট ২০২৩, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রগতিশীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিচলিত হয়ে ওঠেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনলাইনে এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রচার সংগঠিত করি। শিলিগুড়ি শহরে আমাদের দাবিগুলি নিয়ে পোস্টারিং হয়। ■

মণিপুর দাঙ্গার প্রতিবাদে প্রচার কর্মসূচী

মণিপুরের জাতি দাঙ্গার বিরুদ্ধেও আমরা বিভিন্ন সংগঠনের (ছাত্র, শ্রমিক এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনের) যৌথ উদ্যোগে প্রচারে সামিল হই। এ বিষয়ে পোস্টারিং-লিফলেটিং হয় উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, মেখলিগঞ্জ (ডাঙারহাট), কলকাতায় বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথর প্রতিমা, লক্ষ্মীকান্ডপুর, গোচরণ, সোনারপুর এবং নবদ্বীপ-সমুদ্রগড় ইউনিট সহ আরো অন্যত্র।

যৌথ উদ্যোগে আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সোনারপুর এবং বারুইপুরের অবস্থান-বিক্ষোভ ও পথসভায় অংশগ্রহণ করি। ■

বিশেষ রচনা ঃ

প্রতিবেশী

যুগ যুগ ধরে মানুষ শুনে এসেছে আকাশের ঐ চাঁদ নাকি স্বয়ং ভগবান। কেউ বলেছে ওখানে সৃষ্টিকর্তার বাসস্থান, সাত আসমান পেরিয়ে ওখানে কেউ কোনদিন পৌঁছাতে পারে না, চাঁদ মামা মানুষের কাছে চিরকাল হয়ে থাকে অধরা। কেউ বলে ওখানে এক বুড়ি বসে চরকা কাটে, ওখানে মানুষের ঠাঁই নেই।

হিন্দু বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার সময় ব্রাহ্মণের পূজা শেষে প্রসাদ সাজিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এখন ঠাকুর খাবে বলে। এই সময় ঠাকুর ঘরে সকলের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এতে দুষ্ট ছেলের কৌতূহল বেড়ে যায়। সে লুকিয়ে ঠাকুরের খাওয়া দেখতে দরজা ফাঁক করে কাউকে খেতে না দেখে বোঝে এসব বড়দের মিথ্যা গল্প। তেমনই অজানাকে জানা, রহস্যে ঘেরা এই জগতের রহস্যভেদে সত্য অনুসন্ধানীরা থেমে থাকে না। আবিষ্কার হয় দূরের জিনিস দেখার যন্ত্র। সেই দূরবীণ দিয়ে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম দেখলেন, না চাঁদ তো পৃথিবীর মরুভূমির মত এক অঞ্চল, এখানে পৃথিবীর মত আগ্নেয়গিরি আছে। নেই কোন জীবকূল। এরপর থেকে বিগত চার শতাধিক বছর চলেছে হাজার হাজার বিজ্ঞানীর নিরন্তর গবেষণা। এই সকল গবেষণা থেকে পৃথিবীর নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। এখন অতি সংক্ষেপে সেই তথ্যই পেশ করা হচ্ছে।

আমরা খালি চোখে দেখে মনে করি চন্দ্র ও সূর্য সমান আকারের। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় যথাক্রমে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর এবং চাঁদের জন্য সূর্যের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে গ্রহণ হয়। এতে মনে হয় চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী সমান আকারের। আসলে দূরের জিনিস ছোট আর কাছের জিনিস বড় দেখায় তাই আমাদের এমন মনে হয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন চাঁদ সূর্য থেকে ৪০০ গুণ ছোট আর পৃথিবী থেকে ৪ গুণ ছোট। চাঁদের ব্যাসার্ধ ১৭৩৭.৪ কিমি। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিমি। এই সৌরমন্ডলের মধ্যে যত উপগ্রহ আছে আমাদের চাঁদ তাদের মধ্যে আকারে পঞ্চম এবং ভরে দ্বিতীয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সূর্য থেকে আজ থেকে কমপক্ষে ৪৫৬ কোটি বছর আগে আর চাঁদের জন্ম হয়েছে জ্বলন্ত পৃথিবীর সঙ্গে একটি মহাজাগতিক প্রস্তরখন্ডের সংঘর্ষে আজ থেকে আনুমানিক ৪৫৩ কোটি বছর আগে।

পৃথিবীতে যেমন ২৪ ঘন্টা অন্তর দিন বদল হয় যাকে পৃথিবীতে ১ দিন বলে। চাঁদের পূর্ণাঙ্গ দিন হয় পৃথিবীর ১৪ দিন অন্তর। আমরা সবসময়ই চাঁদের একটা পৃষ্ঠ দেখতে পাই অন্য পৃষ্ঠ নজরে আসে না কখনওই। এর কারণ কি? বিজ্ঞানীরা বলেছেন চাঁদ তার অক্ষ বরাবর একবার ঘুরতে যে সময় নেয় পৃথিবীও নিজের অক্ষ বরাবর ঘুরতে একই সময় নেয়। তাই আমরা সবসময়ই চাঁদের একটা পৃষ্ঠ দেখি। এর মানে এই নয় যে চাঁদের অপর পৃষ্ঠে কখনও সূর্যের আলো পড়ে না।

আমরা জানি পৃথিবীতে অভিকর্ষণ ত্বরণ আছে যার ফলে পৃথিবীর বুকে সব বস্তু মাটিতে এসে পড়ে। এটাই আমাদের ওজন থাকার কারণ। চাঁদেও অভিকর্ষ ত্বরণ আছে। কিন্তু তা পৃথিবীর প্রায় ৬ ভাগের একভাগ – ১.৬২ মিটার/বর্গ সেকেন্ড। এই কারণে পৃথিবীতে ১০০ পাউন্ড (৪৫.৪ কি. গ্রা) ওজনের একজন মানুষের ওজন চাঁদে গেলে হবে মাত্র ১৬.৬ পাউন্ড (৭.৫ কি. গ্রা)।

পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল আছে এবং তার বিভিন্ন স্তর আছে। এই বায়ুমন্ডল পৃথিবীর জীবকুলকে রক্ষা করছে। বিজ্ঞানীদের একসময় ধারণা ছিল চাঁদে জীবনের অস্তিত্ব নাই এবং সেখানে বায়ুমন্ডল নাই। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে চাঁদে একটা পাতলা বায়ুমন্ডলের স্তর আছে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসই প্রধান। আর চাঁদের বায়ুমন্ডলে (যাকে এক্সোস্ফিয়ার বলা হয়) আছে হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন (নিষ্ক্রিয় গ্যাস), অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরে যেমন হিলিয়ামের মত নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি আছে তেমনই নিচের স্তরে অ্যামোনিয়া, মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড আছে তার সাথে আছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প।

বায়ুমন্ডলের এই স্বল্পতা সূর্যের কিরণে চাঁদকে অসম্ভব উষ্ণ করে তোলে আর রাতে এই সূর্যকিরণের অধিকাংশই বিকিরিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যায় বলে চাঁদ হয়ে ওঠে অসম্ভব শীতল। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেমন প্রায় +৫০° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় −৫০° সেলসিয়াস, চাঁদে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা +২০০° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় −২০০° সেলসিয়াস।

পৃথিবীর অভ্যন্তর যেমন ভূত্বক, গুরুমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডল (Crust, Mantle, Core) এ বিভক্ত। কেন্দ্রমন্ডলের বহিঃস্তর (outer core) আনুমানিক ২০৯২ কি. মি বেধের এবং তাতে লৌহ ও নিকেলের গলিত তরল থাকে। কেন্দ্রমন্ডলের অন্তস্তরে (inner core) আনুমানিক ২৩০০ কি. মি বেধের এবং তা কঠিন লৌহ, নিকেল নিয়ে প্রধানত গঠিত।

চাঁদের অভ্যন্তরও ভূত্বক, গুরুমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডলে বিভক্ত। কিন্তু কেন্দ্রমন্ডলের বহিঃস্তর এবং বেধ মাত্র ১৫০ মাইল বা ২৪০ কি. মি এবং তাতে গলিত আয়রন আছে। কেন্দ্রমন্ডরের অন্তস্তর প্রায় ৫০০ কি. মি বেধের এবং কঠিন লৌহ দ্বারা গঠিত।

পৃথিভীর কেন্দ্রের বহিঃস্তরের তরল লৌহ-নিকেলের পরিচালন বলের জন্য পৃথিবীতে ভূচৌম্বকত্ব আছে (এবং তা পরিবর্তনশীল) এবং পৃথিবী ভূতাত্ত্বিকভাবে সজীব। চাঁদে সৃষ্টির প্রথম ধাপে কেন্দ্রে লৌহ তরলের পরিচালন বলের ফলে চৌম্বকত্ব ছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই পাতলা গলিত স্তরে পরিচালন বলের অভাবে

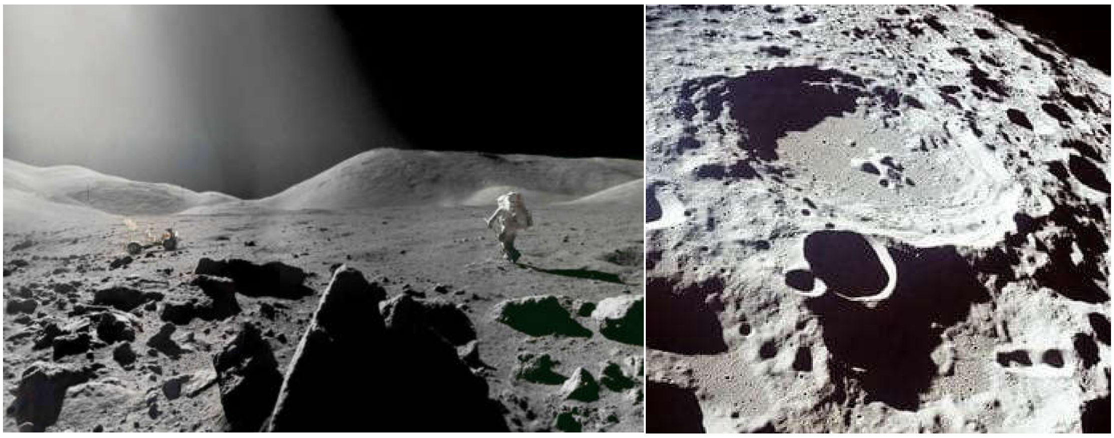

চন্দ্র পৃষ্ঠ (চিত্র-নাসা)

চৌম্বকত্ব নাই। তাই ভূতত্ত্বের ভাষায় চাঁদ বর্তমানে মৃত।

এছাড়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে গুরুমন্ডলের উপরের স্তরে একটি অর্ধগলিত স্তর (অ্যাসথেনোস্ফিয়ার) আছে। এই স্তরের পরিচালন গতির ফলে পৃথিবীতে উপরের কঠিন, স্থিতিস্থাপক প্রস্তরখন্ড (লিথোস্ফিয়ার) আছে যার মধ্যকার সরণের ফলে পৃথিবীতে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ-অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, চ্যুতি, পর্বতমালার ও বেসিনের সৃষ্টিসহ নানা ভূআলোড়ণ চলে। একে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্লেট টেকটনিক্স বলে। চাঁদে এই প্রক্রিয়ার সূচনা সৃষ্টির কিছুকাল পর শুরু হলেও বর্তমানে এমন প্রক্রিয়া বন্ধ। তাই চাঁদে অভ্যন্তরীণ কারণে আলোড়ন বা টেকটনিক প্রক্রিয়া বর্তমানে স্তব্ধ। এই অর্থে চাঁদ একটি মৃত উপগ্রহ।

পৃথিবীতে যেমন নানা পর্বতমালা (ভঙ্গিল স্তূপ ইত্যাদি), নদী, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, সমভূমি, সাগর, অরণ্য দেখা যায়। চাঁদে এর সবকিছুর দেখা মেলে না। চাঁদে ধূমকেতু ও অ্যাস্টোরয়েডের আঘাতে সৃষ্ট ক্রেটর (গর্ত), বেসিন, লাভা স্রোতের চিহ্ন এবং লাভাস্রোতের কারণে গঠিত গঠন দেখা যায়। এছাড়া কয়েকটি টেকটনিক কারণে গঠিত লম্বা পাহাড় ও গিরিখাত দেখা যায়। চাঁদে নদী, সাগর, অরণ্য, সমভূমির অস্তিত্ব নাই। কিন্তু চাঁদে ভূমিকম্প (চন্দ্রকম্প বা moon quake) হয়। এগুলি ঘটে বড় বড় অ্যাস্ট্রোরয়েডের (গ্রহাণু)'র ধাক্কায় এবং চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে ঘটা জোয়ার ভাটার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায়। প্রতিবছর চাঁদে এমন ৬০০-৩০০০ চন্দ্রকম্প হয়।

পৃথিবীতে যেমন ভূত্বকের উপরে মাটি আছে এবং তাতে নানা জৈব ও অজৈব উপাদান আছে এবং যা প্রাকৃতিক ক্রিয়ার (agent) দ্বারা যেমন বায়ু, নদী, হিমবাহ এবং ভূগর্ভস্থ জলের প্রভাবে প্রস্তর চূর্ণের (regolith) পরিবহনের দ্বারা সৃষ্ট। চাঁদে এইসব প্রাকৃতিক এজেন্ট নাই এবং জৈব পদার্থ নাই। এখানে ভূত্বকের উপর স্থানান্তরিত না হওয়া প্রস্তরচূর্ণ (রেগোলিথ) পাওয়া যায়। এই রেগোলিথই চাঁদের মাটি। একে প্রস্তরচূর্ণ, গ্রহাণু টুকরো এবং গ্রহাণুর আঘাতে রেগোলিথের চুর্ণ অ্যাগ্লুটিনেটস পাওয়া যায়। এই মাটি পৃথিবীতে এনে জল দিয়ে বীজের অঙ্কুরোদম করা সম্ভব হয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায় চাঁদের রাসায়নিক বিশ্লেষণেও প্রায় তাই পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন রাসায়নিক হিসেবে চাঁদে ৪৩% অক্সিজেন, ২০% সিলিকন, ১৯% ম্যাগনেশিয়াম, ১০% আয়রন, ৩% ক্যালসিয়াম, ৩% অ্যালুমিনিয়াম, ০.৪২% ক্রোমিয়াম, ০.১৮% টাইটেনিয়াম, ০.১২% ম্যাঙ্গানিজ আছে। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদে অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম কম আর আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম বেশি।

পৃথিবীর ভূত্বকে নানা পাথর পাওয়া যায়। চাঁদে মূলত পৃথিবীর সমুদ্রতলে পাওয়া ব্যাসল্ট এবং অলিভিন ব্যাসল্ট পাওয়া যায়। এছাড়া অ্যানরথোসাইট, ট্রকটোলাইট ও নোরাইট পাওয়া যায়। চাঁদে জলীয় কণা সমৃদ্ধ খনিজ – মাইকা, অ্যাম্ফিবোল পাওয়া যায় না। গভীর খননে চাঁদে সোনা ও রূপার সন্ধান মিলেছে। এছাড়া লৌহ ও টাইটেনিয়াম ধাতু ভাল পরিমাণে আছে। চাঁদের বায়ুমন্ডলের প্রচুর হিলিয়াম পাওয়া যায় যা পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইসরোর চন্দ্রায়ণ-১ চাঁদের মেরু অঞ্চলে জলীয় বরফের উপস্থিতি প্রমাণ করে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে নাসা-র সোফিয়া মিশন চাঁদের উজ্জ্বল দিকের (পৃথিবীর তুলনায়) মাটির মধ্যে জলীয় কণার (H_2O) অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন চাঁদের পৃষ্ঠে আনুমানিক ৬০০০ কোটি কি. গ্রা জলীয় বরফ আছে।

চাঁদের পৃষ্ঠে মানুষের বসবাসে প্রধান বাধা কি কি? বাতাসে মুক্ত অক্সিজেন না থাকা এবং অসম্ভব ঠান্ডা ও গরম ছাড়া অন্য সমস্যা হল – লাগাতার গ্রহাণুর আঘাত এবং চাঁদের রেডিয়েশন। গ্যালাকটিক কসমিস রেডিয়েশন, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সৌর কণা নিউট্রন ও গামা রে-এর বিকিরণ চাঁদের মাটিতে জীবের বসবাসের পক্ষে অন্যতম বাধা। ■

বিশেষ রচনা ঃ

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব রহস্য

– পঞ্চানন মণ্ডল

আজ পৃথিবীর জীবের বসবাসযোগ্য প্রতিটি স্থানে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এমনটা কীভাবে হলো তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। এর থেকে বড় প্রশ্ন আর বোধহয় হয় না! ভাবতেও অবাক লাগে যে পৃথিবী একসময় জলন্ত গ্যাসীয় অগ্নিপিণ্ড ছিল সেই পৃথিবী আজ প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। কীভাবে এলো পৃথিবীতে প্রাণ? কীভাবে জীবনের শুরু? বহু বিজ্ঞানী গবেষক বহু গবেষণার দ্বারা পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির রহস্য উদঘাটন করেছেন। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করত কোনো না কোনো ঈশ্বর বা আল্লাহ বা গড তাঁর নিজের ইচ্ছায় তাঁর মহান শক্তি দিয়ে মানুষসহ কতিপয় উন্নত প্রাণীকে নিমেষেই বানিয়ে দিয়েছেন! তবে নিম্নশ্রেণীর জীব যেমন কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ, সরীসৃপ ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বা আপনা আপনি তৈরি হয়। কয়েক শতাব্দী আগেও প্রাণের আবির্ভাব ও বিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা মানুষের চিন্তারও বাইরে ছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণ সৃষ্টির ধারণাকে পরীক্ষা দ্বারা ভুল প্রমাণ করার জন্য তখন কিছু প্রগতিশীল মানুষ এগিয়ে আসেন। তার মধ্যে ইতালির একজন ডাক্তার ফ্রান্সিসকো রেডি (১৬৬৮ সাল), ইতালীয় বিজ্ঞানী স্পালানজানি প্রমুখরা আছেন। প্রাণের আবির্ভাব কীভাবে হয়েছে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতে থাকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত। এই বিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্যারিস একাডেমি অফ সায়েন্স এগিয়ে আসে। তারা ঘোষণা করে কোনো বিজ্ঞানী যদি পরীক্ষা করে নিশ্চিত করতে পারে প্রাণের আবির্ভাব নিয়ে চালু তত্ত্বের মধ্যে কোন তত্ত্ব সবদিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে এ এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মতো সাহস অনেকের ছিল না। তবে এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। স্বতঃস্ফূর্ত জীব সৃষ্টির মতবাদকে তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রথম পুরোপুরি নসাৎ করেন। তিনি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে কোনভাবেই কোনো জীব আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বারুদের বিস্ফোরণের জন্য ব্যবহৃত গান কটনের মধ্য দিয়ে বায়ু চালনা করে দেখেন যে ঐ তুলোর মধ্যে প্রচুর অণুজীব আটকে যাচ্ছে। এই অণুজীবগুলোই নিডহ্যাম ও স্পালানজানির খোলামুখ ফ্লাস্কের পরীক্ষায় স্যুপের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করছে। খোলা মুখ ফ্লাস্কে পাওয়া অণুজীবেরা বাতাস থেকে 'লাইফ ফোর্স' সংগ্রহ করছে না, বরঞ্চ তা বাতাসে আগে থেকেই উপস্থিত অণুজীব সংগ্রহ করছে। পাস্তুর তাঁর এই ধারণা প্রমাণের জন্য অসম্ভব সুন্দর এক পরীক্ষার আয়োজন করেন। পাস্তুর তাঁর এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণের উদ্ভবের স্বতঃস্ফূর্ত মতবাদের অপমৃত্যু ঘটান। প্যারিস একাডেমি অফ সায়েন্স তাদের দেওয়া কথা মতো পাস্তুরকে আলহমবার্ট পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। পাস্তুরের এই পরীক্ষার পরে প্রাণের আবির্ভাব নিয়ে বিতর্ক পুরোপুরি থেকে গেছে বা তাঁর তত্ত্ব তারপর থেকে সবাই মেনে নিয়েছে তা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই! পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে পরবর্তীতে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বহু বিজ্ঞানী নিরন্তর গবেষণা করে গেছেন এবং সেই গবেষণা বর্তমানেও অব্যাহত।

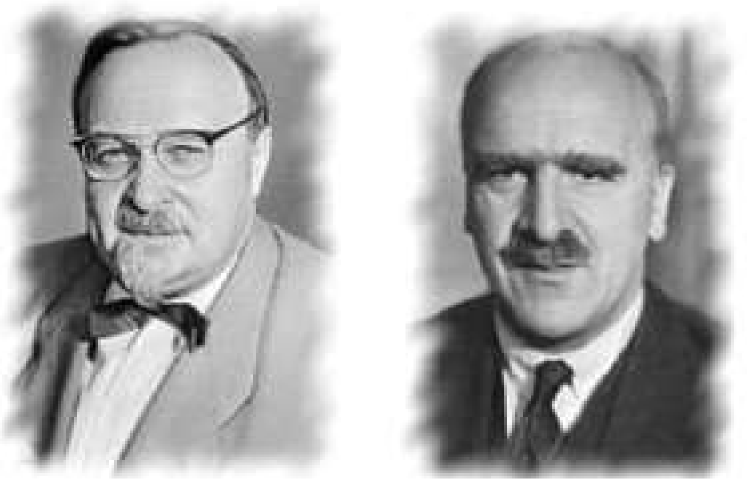

বিজ্ঞানী এ. আই. ওপারিন ও বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন

তবুও সেগুলো নিয়ে তর্কবিতর্কও অব্যাহত।

আধুনিক মতবাদগুলির মূল কথা হলো কোনো অলৌকিক ঈশ্বর জীবন বা জীব সৃষ্টি করেনি বা হঠাৎ করে কোনো জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নি, পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব এক বিবর্তনীয় পর্যায়ক্রমিক ঘটনা। এমনকি বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষাগারে সৃষ্টির আদিতে যেমন পরিবেশ ছিল কৃত্রিমভাবে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ কীভাবে হয়েছিল তা পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এইসব গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটা কোন বিজ্ঞানীর একক প্রচেষ্টা নয় বহু বিজ্ঞানীর নিরলস বিজ্ঞান সাধনার ফল। আজকে অনেক বিজ্ঞানীই প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তারা আত্মপ্রত্যয়ী যে তারা সঠিক পথেই আছেন এবং তাদের আত্মপ্রত্যয় দাঁড়িয়ে আছে বহু বছর ধরে বহু বিজ্ঞানীর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা লব্ধ ফলাফলের উপর।

আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কারকে ঘিরে প্রাণের সৃষ্টি রহস্য অপরিসীম উৎসাহ, সংগ্রাম এবং অসাধারণ সৃষ্টিশীলতায় পরিপূর্ণ। মানুষের বহু অনুসন্ধিৎসার মধ্যে জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অন্যতম। তাই প্রাণের সৃষ্টি রহস্য খুঁজতে বিজ্ঞানীদের চিরায়ত বিশ্বাসের বাইরে এসে কাজ করতে হয়েছে।

প্রাণ এর আবির্ভাব কয়েক বিলিয়ন বছর আগে। ডায়নোসর সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত বিলুপ্ত প্রাণী যারা কিনা প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে দাপিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু প্রাণের জন্ম খুঁজতে আমাদের আরও সুদূর অতীতে যেতে হবে। আমাদের চেনাজানা সবচেয়ে পুরনো জীবাশ্মের বয়স প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর যা কিনা সবচেয়ে পুরনো ডায়নোসরের থেকেও ১৪ গুণ বেশি পুরনো। কিন্তু জীবাশ্মের প্রাপ্ত বয়স হয়ত আরও অতীতের হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের অগাস্টে গবেষকগণ ৩.৭ বিলিয়ন বছর আগের আণুবীক্ষণিক অণুজীবের ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন। তবে আমাদের পৃথিবী নিজেও খুব বেশি পুরনো নয়। পৃথিবী গঠিত হয়েছিল প্রায় ৪.৫৬ বিলিয়ন বছর আগে। যদি আমরা ধারণা করি প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল এই পৃথিবীতেই তাহলে সেটা যুক্তিপূর্ণ এবং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কারণ আমাদের জানা মতে মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আমরা এখনো খুঁজে পাইনি। সংরক্ষিত পুরনো জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বোঝা যায় যা কিছু ঘটেছে সেটা পৃথিবী গঠনের পরে এবং ৪.৫ বিলিয়ন বছরের মধ্যে। একই সাথে আমরা যদি প্রাণের বিকাশ মুহূর্তের কাছাকাছি চলে যাই তাহলে প্রকৃতপক্ষেই সৃষ্টিলগ্নে কেমন ছিল তার আধুনিক ধারণা পাবো।

১৯ শতক থেকেই জীববিজ্ঞানীগণ জানেন সব ধরনের জীবিত সত্তাই 'কোষ' দ্বারা গঠিত যা মূলত বিভিন্ন রকম এবং আকারের অতি ক্ষুদ্র জীবিত বস্তুকণার সমষ্টি। ১৭ শতকে আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরে প্রথম কোষের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কোষ যে জীবনের উৎপত্তির প্রায় শুরুতে এসেছে সেটা বুঝতে প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগেছে। বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন আমাদেরকে একটা কোষ সৃষ্টি করতে হলে অন্তত ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর পরিবেশগত অবস্থা এবং উপাদান লাগবে।

আপনি ভাবতে পারেন যে আপনি দেখতে একটি মাছের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র মাছের দেহের একটি কোষ আর আপনার একটি কোষের প্রচুর মিল খুঁজে পাবে! মানে মাছ ও আপনি প্রায় একই ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি! বিভিন্ন ধরনের গাছপালাও তাই।

কিন্তু এখন পর্যন্ত জীবনের সর্বাধিক অসংখ্য রূপ হল অণুজীব, যার প্রত্যেকটি মাত্র একটি কোষ দ্বারা গঠিত। তারা এককোষী। ব্যাকটেরিয়া হল সবচেয়ে বিখ্যাত অণুজীব যা কিনা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বায়োস্ফিয়ারে পাওয়া যায়। আর প্রতিটি বহুকোষী উন্নত জীব এককোষী জীব থেকে বিবর্তনের দ্বারা এসেছে। এর মানে আমরা জীবনের উৎপত্তির সমস্যাটিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে পাওয়া উপাদান এবং অবস্থা ব্যবহার করে, আমাদের একটি কোষ তৈরি করতে হবে।

কয়েক শতাব্দী আগেও জীবন কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই প্রশ্ন করা সত্যিই প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়নি, কারণ এই প্রশ্নের ধর্মীয় উত্তর স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। মহান ঈশ্বর জীবের জীবন দিয়েছেন।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগে, বেশিরভাগ মানুষ "প্রাণবাদ" বা ভাইটালিজম এ বিশ্বাস করত। এটি হল স্বজ্ঞাত ধারণা যে জীবিত যা কিছু তা বিশেষ, যাদুকরী বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল যা তাদের জড় বস্তু থেকে আলাদা করে তুলেছিল।

ভাইটালিজম তখন লালিত ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে আবদ্ধ ছিল। বাইবেল বলে যে ঈশ্বর প্রথম মানুষকে সজীব করার জন্য "দ্য ব্রিথ অফ লাই" "the breath of life" ব্যবহার করেছিলেন আর মানুষের অমর আত্মা হল প্রাণশক্তির এক রূপ।

তবে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে, বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন যা জীবনের জন্য অপরিসীম বলে মনে করা হয়েছিল। এরকম একটি রাসায়নিক ছিল ইউরিয়া, যা আমাদের মূত্রে পাওয়া যায়।

এটি, প্রাণশক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। শুধুমাত্র জীবন্ত জিনিসগুলি এই রাসায়নিকগুলি তৈরি করতে সক্ষম বলে মনে

হয়েছিল, তাই সম্ভবত তারা জীবন শক্তির সাথে মিশ্রিত হয়েছিল এবং এটিই তাদের বিশেষ করে তুলেছিল।

তবুও, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের পরে বিজ্ঞানীদের কাছে প্রথম জীবন কীভাবে উৎপত্তি হয়েছিল তা ঈশ্বর/গড সৃষ্টি করেছে এর বিপরীতে অলৌকিক ধারণা-মুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার বৈধ কারণ ছিল। কিন্তু তারা তা ঠিকমতো করতে পারেন নি। তখন তা অন্বেষণ করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, বাস্তবে কিন্তু জীবনের সৃষ্টি রহস্য জানার জন্য কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ সম্ভবত অনেকেই পরবর্তীতে ভাইটালিজম মতবাদকে খুব আবেগগতভাবে আপন করে নিয়েছিলেন!

১৯ শতকে জীবের সৃষ্টি রহস্যের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি ছিল বিবর্তনবাদ। যার অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন। ডারউইনবাদ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ, যা ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'অন্য দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন' গ্রন্থে ডারউইন ব্যাখ্যা করেছিলেন। কীভাবে জীবনের বিশাল বৈচিত্র্য একটি একক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। ঈশ্বরের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে তৈরি হওয়া বিভিন্ন প্রজাতির প্রতিটির পরিবর্তে, তারা সকলেই আদিম পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ফলে এসেছে।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ অত্যন্ত বিতর্কিত বলে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ তা জীবের আবির্ভাব নিয়ে বাইবেলের বিপরীত কথা বলে। ডারউইন এবং তাঁর বিবর্তনবাদ চিরায়ত ধর্মীয় ধারণার বিপরীতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে জৈব বিবর্তন ব্যাখ্যা করে।

তবে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ জৈব বিবর্তন ব্যাখ্যা করলেও প্রথম প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে বা প্রথম জীব কীভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে সে সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কথা বলেন নি। বিস্তারিত না বললেও এটা বলেছিলেন যে প্রাণের আবির্ভাব বিবর্তনের ফলে পর্যায়ক্রমে হয়েছে।

যদিও ডারউইন জানতেন যে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে তা একটি গভীর প্রশ্ন, কিন্তু – সম্ভবত চার্চের সাথে আরেকটি লড়াই শুরু করার বিষয়ে হয়তো কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। যে কারণে মানুষের বিবর্তন নিয়ে তাঁর বই 'ডিসেন্ট অফ হিউম্যান' লিখলেও বিতর্ক এড়াতে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তা প্রকাশ করেন নি। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে তিনি সেই প্রশ্নের গভীর তাৎপর্য জানতেন – "যদি আমরা অ্যামোনিয়া, ফসফরিক লবণ সহ, আলো, তাপ, তড়িৎ একটি ছোট উষ্ণ গরম পুকুরে ধারণ করি তাহলে দেখা যাবে যে একটি প্রোটিন যৌগ রাসায়নিকভাবে গঠিত হয়, যা আরও কিছু সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। কারণ সে এক জটিল পরিবর্তন এর মধ্য দিয়ে যায় ..."

অন্য কথায়, যদি কোনভাবে একটি ছোট উষ্ণ পুকুরের জল, সরল জৈব যৌগ দিয়ে ভর্তি করে সূর্যের আলোতে আলোকিত করা হতো, তাহলে এই যৌগুলির মধ্যে কিছু একটি প্রোটিনের মতো জীবন-সদৃশ পদার্থ তৈরি করতে একত্রিত হতে পারত, যা পরে বিকশিত হয়ে আরও জটিল হয়ে উঠতে পারত।

তবে এটি ডারউইনের একটি সাধারণ ধারণা ছিল, কোনো পরীক্ষালব্ধ ফল ছিল না, তবুও এটা কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল তার প্রথম অনুমানের ভিত্তি হয়ে ওঠে। সেই জন্য পরবর্তীতে আলেকজান্ডার ওপারিন ডারউইনের তত্ত্ব থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন।

এক দ্বন্দ্বমূলক আবহে আলেকজান্ডার ওপারিন জৈব রসায়ন নিয়ে রাশিয়ার মস্কোতে গবেষণা করেছিলেন। তিনি তাঁর কাজ স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি যে দেশে জন্মেছিলেন বা গবেষণা করেছিলেন তা তখন অনেকটা ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত ছিল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে, ওপারিন তার 'দ্য অরিজিন অফ লাইফ' বইটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি জীবনের উৎপত্তির একটি দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করেছিলেন যা চমকপ্রদভাবে ডারউইনের উষ্ণ ছোট পুকুরের মতো ছিল।

ওপারিনের সুস্পষ্ট মত ছিল পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা আকস্মিক ভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনা হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। কোনো এক অলৌকিক শক্তি বা কোনো ঈশ্বর-এর অপার মহিমায় ভাগ্যক্রমে হঠাৎ প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে বলে যে ধর্মীয় তত্ত্ব প্রচলিত আছে তার কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ ভিত্তি নেই। বরং প্রাণের আবির্ভাব প্রক্রিয়াকে মহাবিশ্বের বিকাশের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখা উচিত।

ওপারিন ভেবেছিলেন পৃথিবী কেমন ছিল যখন তা জীবন সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশে পৌঁছেছিল। তাঁর মতে তখন ভূপৃষ্ঠ অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল, কারণ মহাকাশ থেকে গরম শিলা পৃথিবীর উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তার প্রভাব খুব একটা কম ছিল না। এটি আধা-গলিত শিলাগুলির ছড়ানো ছিটানো অবস্থায়, প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক ছিল – যার মধ্যে অনেকগুলি কার্বনের যৌগ ছিল।

অবশেষে পৃথিবী জলীয় বাষ্পকে তরল জলে ঘনীভূত করার জন্য পৃথিবী যথেষ্ট ঠান্ডা হয়েছিল। বৃষ্টি পড়েছিল। অনেক আগে পৃথিবীতে মহাসাগর ছিল, যেগুলি গরম এবং কার্বন-ভিত্তিক রাসায়নিক সমৃদ্ধ ছিল।

এখনি দুটি জিনিস ঘটতে পারে।

প্রথমত, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ একে অপরের সাথে

বিক্রিয়া করে প্রচুর নতুন যৌগ তৈরি করতে পারে, যার মধ্যে কিছু আরও জটিল যৌগ হবে। ওপারিন মনে করেছিলেন যে শর্করা এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের মতো কার্বনের যৌগগুলো জীবনের কেন্দ্রীভূত অণুগুলি পৃথিবীর জলে তৈরি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কিছু রাসায়নিক আনুবীক্ষণিক কাঠামো তৈরি করতে শুরু করে। অনেক জৈব রাসায়নিক জলে দ্রবীভূত হয় না; যেমন তেল জলের উপরে একটি স্তর তৈরি করে। কিন্তু যখন এই রাসায়নিকগুলির মধ্যে কোনো কোনো রাসায়নিক জলের সাথে রাসায়নিক সংযোগ স্থাপন করে তখন তারা "কোয়াসার্ভেট" নামে গোলাকার গঠন তৈরি করে।

আপনি যদি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোসার্ভেটগুলি দেখেন তবে তারা জীবিত কোষের মতো আচরণ করে। তারা বৃদ্ধি পায় এবং আকৃতি পরিবর্তন করে এবং কখনও কখনও দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। তারা আশেপাশের জল থেকে রাসায়নিক গ্রহণ করতে পারে, তাই জীবনের মতো রাসায়নিকগুলি তাদের ভিতরে ঘনীভূত হতে পারে। ওপারিন প্রস্তাব করেছিলেন যে কোসার্ভেটগুলি আধুনিক কোষের পূর্বপুরুষ।

ওপারিনের 'অরিজিন অফ লাইফ' প্রকাশের পাঁচ বছর পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে, ইংরেজ জীববিজ্ঞানী জে বি এস হ্যালডেন স্বাধীনভাবে Rationalist Annual-এ প্রকাশিত একটি ছোট নিবন্ধে জীবনের উৎপত্তির কিছু অনুরূপ ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন।

হ্যালডেন ইতিমধ্যেই বিবর্তনীয় তত্ত্বে প্রচুর অবদান রেখেছিলেন, নবাগত জিনতত্ত্ব বিজ্ঞানের সাথে ডারউইনের ধারণাগুলিকে একীভূত করতে সাহায্য করেছিলেন। হ্যালডেনও ছিলেন পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

ওপারিনের মতোই, হ্যালডেন জলে কীভাবে জৈব রাসায়নিকগুলি তৈরি হতে পারে তার রূপরেখা দিয়েছেন, তবে তিনি ওপারিনের তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবলাহ ছিলেন না। হ্যালডেনের মতে পৃথিবীর আদিম পরিবেশে আদিম মহাসাগরগুলি গরম পাতলা স্যুপের বা হট ডাইলিউট স্যুপ এ পৌঁছেছিল। আদিম পরিবেশে আবির্ভূত জৈব অণুগুলি সমুদ্রের জলে মিশে জীব সৃষ্টির অনুকূল এক অবস্থার সৃষ্টি করে। হ্যালডেনের মতবাদকে রাসায়নিক বিবর্তনবাদ বলা হয়। জীব সৃষ্টির পূর্বে জৈব যৌগ সৃষ্টি এই মতবাদের মূল কথা।

বিশ্বের সমস্ত জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে ওপারিন এবং হ্যালডেন জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রায় একই রকম প্রস্তাব করেছিলেন। কোন ঈশ্বর ছাড়া বা এমনকি "ভাইটালিজম" ছাড়াই বিশুদ্ধভাবে রাসায়নিক উপায়ে প্রাণ সৃষ্টির মৌলিক ধারণা তাঁরাই প্রথম সুস্পষ্ট ভাবে দিয়েছিলেন।

হ্যালডেনের মতবাদ ততটা সমালোচনার মুখে পড়েনি কারণ এটা ওপারিনের মতবাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। বিশেষ করে তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার নেতৃত্বগণ জীবনের উৎপত্তির মতো গভীর ঘটনার জন্য বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সমর্থন করতে আগ্রহী ছিলেন। আর হ্যালডেনও একজন বস্তুবাদী মানুষ ছিলেন।

জার্মানির ওসনাব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অরিজিন অফ লাইফ' বিশেষজ্ঞ আর্মেন মুলকিদজানিয়ান বলেন, "সেই সময়ে, ওপারিন ও হ্যালডেনের এই ধারণাটি গ্রহণ করা বা না নেওয়া মূলত ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যারা ধার্মিক তারা এই ব্যাখ্যা মেনে নেয় নি আবার যারা নাস্তিক বা বস্তুবাদী তারা এই ব্যাখ্যকে সমর্থন করেছেন। তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নে সানন্দে এই মতবাদ গৃহীত হয়েছিল কারণ তাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল না।

জৈব রাসায়নিকের একটি আদিম উষ্ণ তরল স্যুপে প্রাণের উৎপত্তির যে ধারণা স্বতন্ত্রভাবে ওপারিন ও হ্যালডেন দিয়েছিলেন তা সম্মিলিতভাবে বর্তমানে ওপারিন-হ্যালডেন মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ জীবনের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় খুবই কার্যকরী আবার সবার কাছে সহজবোধ্য ছিল। কিন্তু তা স্বত্তেও সমস্যা একটি ছিল! কারণ একে প্রতিষ্টা করার জন্য কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ তখন ছিল না। কিন্তু তাও পরবর্তীতে প্রমাণ হয়ে গেল বিশ্ববিখ্যাত এক যুগান্তকারী পরীক্ষার মাধ্যমে। এক শিক্ষক হ্যারল্ড উরে আর তার এক ছাত্র স্টানলি মিলারের হাত ধরে।

অধ্যাপক হ্যারল্ড উরে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি এইসময় মহাকাশের রসায়নেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে সৌরজগতের প্রথম গঠনের সময় কী ঘটেছিল। তিনি একটি সভায় বলেছিলেন যে আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সম্ভবত কোন অক্সিজেন ছিল না যখন এটি প্রথম গঠিত হয়েছিল। তাই ওপারিন ও হ্যালডেন এর প্রস্তাবিত প্রাইমডিয়াল স্যুপ গঠনের জন্য আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। আদিম পরিবেশে অক্সিজেন থাকলে রাসায়নিকগুলি অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে ধ্বংস হয়ে যেত।

স্ট্যানলি মিলার নামে একজন ডক্টরাল ছাত্র সেই সভায় শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি পরে একটি প্রস্তাব নিয়ে উরের কাছে গিয়েছিলেন। – 'আমরা কী ওপারিন-হ্যালডেন মতবাদের পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পারি না? উরে সন্দিহান ছিলেন কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে রাজি হয়েছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে স্টানলি মিলার, হ্যারল্ড উরের তত্ত্বাবধানে সেই ঐতিহাসিক পরীক্ষা করেছিলেন। স্ট্যানলি মিলার এক সুন্দর

সহজ পরীক্ষা দ্বারা ওপারিন-হ্যালডেন মতবাদ এর প্রথম ধাপ রাসায়নিক বিবর্তন (Chemical evolution) প্রমাণ করেন। মিলার পরীক্ষাগারে পৃথিবীর আদিম আবহাওয়া সৃষ্টি করে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখান যে পৃথিবীর প্রাথমিক আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প, মিথেন, অ্যামাইনো অ্যাসিড বা অন্যান্য জটিল জৈব অণু সৃষ্টি করা যায়। এই পরীক্ষা থেকে মিলার ও উরে প্রমাণ করেছিলেন আদিম পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বৈদ্যুতিক বিচ্ছুরণ এর ফলে বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড ও বিভিন্ন জটিল জৈব অণু গঠিত হয়েছিল যা জীবন সৃষ্টি প্রধান পদক্ষেপ বলা যায়।

সেই পরীক্ষার সেট আপ খুব সহজ ছিল। মিলার কাচের ফ্লাস্কগুলির একটি সিরিজ সংযুক্ত করেছিলেন। তাতে চার ধরনের রাসায়নিক নিয়েছিলেন, যা তিনি অনুমান করেছিলেন যে আদিম পৃথিবীতে সেগুলো উপস্থিত ছিল। ফুটন্ত জল, হাইড্রোজেন গ্যাস, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন। তিনি গ্যাসগুলিকে বারবার বৈদ্যুতিক স্পার্ক দিয়েছিলেন, আদিম পৃথিবীতে বজ্রপাতের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার জন্য যা এতদিন আগে পৃথিবীতে একটি সাধারণ ঘটনা ছিল।

মিলার দেখতে পান যে প্রথম দিনের পরে ফ্লাস্কের জল লক্ষণীয়ভাবে গোলাপী হয়ে ওঠে এবং সপ্তাহের শেষে দ্রবণটি গাঢ় লাল ও ঘোলাটে হয়ে যায়। স্পষ্টতই, রাসায়নিকের মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল। মিলার যখন মিশ্রণটি বিশ্লেষণ করেন তখন তিনি দেখতে পান যে এতে দুই রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে ঃ গ্লাইসিন এবং অ্যালানিন। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে সাধারণত জীবনের বিল্ডিং ব্লক হিসাবে ধরা হয় কারণ এগুলি প্রোটিন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যা আমাদের দেহের বেশিরভাগ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে মিলার ও উরে দেখাতে সক্ষম হন যে প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিকগুলি প্রকৃতিতে প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হওয়া সম্ভব। মিলারের পরীক্ষার ফলাফল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞানী উরের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাটি হলেও, উরে অত্যন্ত উদারতা দেখিয়ে মিলারকে এই পরীক্ষার সব কৃতিত্ব দেওয়ার জন্য তার নাম তুলে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, আমরা প্রায়ই এই ঐতিহাসিক গবেষণাটি "মিলার-উরে পরীক্ষা" বলে থাকি। মিলার ও উরে এভাবেই প্রায় সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থায় সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণের বিকাশে অপরিহার্য এমন প্রচুর জৈব অণু তৈরি করতে পেরেছিলেন।

মিলারের পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে, পরবর্তীতে বহু বিজ্ঞানী নিজের মতো করে সহজ জৈবিক অণু তৈরি করার উপায় খুঁজে বের করতে শুরু করেন। এর থেকে অনেকের জীবনের উৎপত্তি রহস্যের সমাধান কাছে পৌঁছে গেছি মনে হয়েছিল।

কিন্তু তারপরে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে প্রাণের উৎপত্তি যত জটিল ভাবা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি জটিল। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও আজও বিতর্ক আছে। মিলারের পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের মধ্যে তখন জোর বিতর্ক তুলেছিল তা হলো প্রাণ সৃষ্টির জন্য কোন জৈব যৌগ প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল আর কোথায় সৃষ্টি হয়েছিল? তবে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর মতে সমুদ্রের জলে প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়। আর আমাইনো অ্যাসিড হলো প্রথম জৈব যৌগ। মিলার-উরের পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই জৈব রসায়ন বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স বলেন যে পৃথিবীর আদিম পরিবেশে বিভিন্ন আমাইনো এসিড যৌগ সৃষ্টি হওয়ার পর এই যৌগ নিজেদের মধ্যে জুড়ে জুড়ে খুবই সাধারণ প্রাথমিক ধরনের প্রোটিন সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে এই প্রোটিনগুলো আরো জটিল হয়ে নানা বৈচিত্র্যময় কাজ করতে সক্ষম হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো উৎসেচক হিসাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করা। কারণ যে কোনো ধরনের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া উৎসেচক ছাড়া সম্ভব নয়। এরপর বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরো একটি প্রশ্ন ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় তা হলো প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রোটিন তৈরি হওয়া কতটা জৈব রসায়ন স্বীকৃত? কারণ এরপর আমরা জেনে গেছি প্রোটিন নয় প্রাণের মুখ্য অণু নিউক্লিক এসিড, মূলত ডিএনএ। বহু বিজ্ঞানী বলতে শুরু করেন আদিম পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে যখন থেকে নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন হয়েছে তখন থেকে। আর প্রথমে এসেছে আরএনএ ও পরে ডিএনএ। তবে আরএনএ-কে ডিএনএ-এর পরিপূরক বলে অনেকে মনে করেন। আর আরএনএ-কে যদি প্রাণের আদি উৎসের প্রথম নিউক্লিক এসিড হিসাবে ভাবা হয় তাহলে আমরা অন্য প্রক্রিয়ায়, যা প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় তার হদিস পাই।

যাইহোক নিউক্লিক এসিড পরবর্তীতে প্রোটিন আবরণ এর মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের চারিদিকে প্রাচীর গঠিত হয়ে কোষ তৈরি হয়। প্রথমে নিউক্লিয় বস্তু বিক্ষিপ্তভাবে ছিল ও কোষীয় অঙ্গাণুগুলো সজ্ঘবদ্ধ ছিল না, এদের আদিকোষ যুক্ত জীবকে প্রোক্যারিওটিক বলা হয়। পরে কোষীয় অঙ্গানু সজ্ঘবদ্ধ হয় ও অনেক নিউক্লিয় বস্তু একত্রিত হয়ে প্রকৃত নিউক্লিয়াস গঠন করে ও ইউক্যারিওটিক জীব সৃষ্টি হয়। ■

বিজ্ঞানী এ. আই. ওপারিন এবং বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন-এর জীবনী আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। – সম্পাদক, সমীক্ষণ

চয়ন ঃ

ভারত কেন স্কুলের বিজ্ঞান পাঠক্রম থেকে বিবর্তন এবং পর্যায় সারণী বাদ দিচ্ছে?

[৩০শে মে ২০২৩ তারিখে বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল 'নেচার' ভারতের স্কুলের পাঠক্রমের পরিবর্তনের বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। পাঠকদের অবহিত করতে এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির বাংলা ভাবানুবাদ আমরা প্রকাশ করলাম। এখানে বিষয়টি সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে, তা একান্তই 'নেচার' পত্রিকার নিজস্ব মতামত। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

সম্পাদকীয় নেচার ৩০শে মে ২০২৩

ভারতের পাঠ্যক্রম তৈরির সংস্থাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, কেন তাঁরা স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে মৌলিক বিষয়গুলি সরিয়ে দিয়েছে।

ভারতের স্কুল পাঠ্যক্রম সংস্থা এই পরিবর্তনের বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক এবং গবেষকদের সঙ্গে পরামর্শ করেনি।

"To develop the Scientific temper, humanism and the spirit of enquiry and reform"

[অর্থাৎ বিজ্ঞান মনস্বতা তৈরির জন্য চাই মানবতা এবং অনুসন্ধিৎসু মন] – এই কথাগুলি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সংবিধানের একটি সংশোধনীতে যুক্ত করা হয়েছিল। সংবিধান প্রণেতারা যথার্থই প্রমাণ, যুক্তি এবং মানবতার সাধনাকে প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব হিসাবে দেখেছেন। কারণ এর প্রায় তিন দশক আগে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত তার ইতিহাসের সবথেকে উত্তাল সময় থেকে উঠে এসেছে।

কিন্তু দেশের শিক্ষা নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কাছে এখন এই বিষয়গুলি কম মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে। স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে পর্যায় সারণী বিষয়টি সরিয়ে ফেলা হয়েছে, বিবর্তনবাদ বাদ পড়েছে, বাদ পড়েছে তড়িৎচুম্বকত্বের ব্যাখ্যা, ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রম থেকে বাদ গিয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতিশীল ব্যবহারের ধারণাও (sustainable use of natural resources)।

বিগত সময়ে কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন পড়ুয়াদের পড়ার চাপ কমাতে বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলি পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রম থেকে তা পুরোপুরি ছেঁটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT), ভারতের পাঠ্যপুস্তক তৈরির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত কিন্তু কার্যত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। কিন্তু তারা এই পরিবর্তনগুলি নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি। অথচ এই পরিবর্তন ৩৮ মিলিয়নেরও (৩ কোটি ৮০ লক্ষ) বেশি যেসব ছাত্রছাত্রীদের, তাদের অভিভাবকদের, শিক্ষক ও গবেষকদেরও প্রভাবিত করবে। যেসব ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানে আগ্রহী তারা অনেকে নেচারকে বলেছে যে এই নতুন পাঠক্রমে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তাদের যে ঐসব বাদপড়া বিষয়ে আগ্রহ নেই তা নয়।

...

এনসিইআরটি বলে যে যৌক্তিকতার প্রয়োজন তখন, যখন পাঠক্রমের অন্য কোথাও একই বিষয় আলোচিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে বা বিষয়বস্তুটি এখন অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। তদুপরি, ভারতের ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি বলে যে শিক্ষার্থীদের থেকে মুখস্ত করার প্রবণতা দূর করে বিশ্লেষক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এনসিইআরটি চায় "ভারতের ঐতিহ্য, গর্ব, সমৃদ্ধি, বৈচিত্রময়তা, প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ব্যবস্থা।" অনেকে বলেছেন এনসিইআরটি চাইছে চার্লস ডারউইন, মাইকেল ফ্যারাডেকে অপসারণ করে পরিবর্তে ভারতের বিজ্ঞানের প্রাক-ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কে আরও তথ্য পাঠক্রমে আনতে।

ভারতই একমাত্র উত্তর-উপনিবেশিক দেশ নয় যে তার স্কুল পাঠক্রমে প্রাচীন জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। নিউজিল্যান্ড মাওরি 'জানার উপায়' – মাতাউরাঙ্গা মাওরি (Maori 'Ways of knowing' - matauranga maori) সেখানকার শিক্ষাক্রমে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা সে জন্য অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুকে অপসারণ করে নি।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়া এবং পর্যায় সারণীর অর্ন্তনিহিত নীতিগুলি উভয়ই বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করে, শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুতে অন্তর্দৃষ্টি দিতে, অবাক হতে উৎসাহিত করে। ... জীবন হল সকল মহৎ বিন্যাস ও সমবায়ের ফসল। আবার পর্যায় সারণী হল রাসায়নিক মৌলগুলির একটি আশ্চর্যজনক ছোট সেট যা আমাদের ভৌত জগতের বিল্ডিং ব্লক তৈরি করে। তাই কীভাবে এই দুটি বিষয় যা ইতিপূর্বে পাঠক্রমে ছিল, তা ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য এনসিইআরটি'কে উদ্যোগ নিতে হবে।

বিকল্প পদ্ধতি –

তদুপরি, এই পর্যন্ত চিরাচরিত বইয়ের বদলে ভিজুয়াল পদ্ধতি,

যেমন ভিডিও এবং অ্যানিমেশন ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের শেখানো চালু হয়েছে। আর একটি বিকল্প পদ্ধতি হল নন-ফিকশন বর্ণনামূলক গল্প বলার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলো তুলে ধরা। পর্যায় সারণির ক্ষেত্রে, পৃথক মৌলগুলি কীভাবে তাদের নির্দিষ্ট স্থান পেয়েছে তা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করতে হবে; বড় বা ছোট নাটক বা ঐ ধরনের কিছু দ্বারা কীভাবে মৌলগুলি আবিষ্কার হয়েছে, আবিষ্কারের কৃতিত্ব এসব ছাত্রছাত্রীদের সামনে নিয়ে আসতে হবে।

মূল বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি (core scientific concepts) শেখা, সমস্যা সমাধানের অনুশীলন করা ও বিজ্ঞানের ইতিহাসের গভীরে অনুসন্ধান করা – স্থানীয় এবং বৈশ্বিক উভয়ই – বিচ্ছিন্নভাবে করা উচিৎ নয়। বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশ এবং ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব একত্রে হাত ধরাধরি করে চলতে পারে। যেমন আমরা আগেও লিখেছি, আগে যা এসেছে তার দৃঢ় উপলব্ধি ছাড়া নতুন গবেষণা এগোয় না। সংক্ষেপে বললে বিজ্ঞান এবং ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক।

গবেষকরা যাঁরা ভারতের শিক্ষানীতি নিয়ে বহু চর্চা করেছেন, তাঁরা 'নেচার'কে বলেছেন যে বিজ্ঞানের সমালোচনাকারী সংস্থাগুলি পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এই পরিবর্তনগুলির পক্ষে আছেন এবং তারা এই কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছেন। তারা বিশেষ করে একটি সংগঠনের দিকে ইঙ্গিত করে : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, যার ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

এনসিইআরটিকে অবশ্যই ভারতের বৃহত্তর জনতার মতামত শুনতে হবে। (need to listen to opinions from the full community spectrum)। কিন্তু, একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে, এটি অবশ্যই তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নেবে এবং সর্বদা সর্বোত্তম পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে তা প্রয়োগ করবে। তাদের সিদ্ধান্তে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে, কারণ তাদের সিদ্ধান্ত শুধু ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নয়, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক এমনকি গবেষকদের সাথে সম্পর্কিত। তাই তারা কোনো ধরনের জল্পনা কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হলে তা সঠিক নাও হতে পারে।

এনসিইআরটিকে তার নিরবতার ব্রত ভঙ্গ করতে হবে। খুব কম লোকই এর ক্রিটিক্যাল চিন্তাভাবনাকে বাড়িয়ে তোলার উচ্চাকাঙ্খাকে এবং কাজ করে শেখার প্রচার বা শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষা উপভোগ করার আকাঙ্খাকে সমস্যা হিসেবে নেবে। ভারতের শিক্ষার বিকাশে প্রাক এবং উত্তর-উপনিবেশিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ইতিহাস হাতে হাত রেখে চলতে পারে। ■

চিঠিপত্র ঃ

মানুষ মরণশীল। বস্তুজগতের সমস্ত প্রাণী-উদ্ভিদ সকলেরই জন্ম ও মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু পরবর্তিত রূপের যে নিয়ম অর্থাৎ বিবর্তনের যে ধারা তা কিন্তু চিরায়ত সত্য। এই বিবর্তনের ধারা বা বিবর্তনবাদ – যা ডারউইন, প্যাভলভ, লাইসেঙ্কো, মিনিয়াস প্রভৃতি বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যায় আমরা প্রাণের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, যোগ্যতমের জয়ের মধ্যে দিয়ে বিবর্তন কিভাবে এগিয়ে চলেছে তা জানতে পারি।

কার্ল মার্কস এই বিষয়টিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যদিয়ে সাবলিল ভাবে পরিষ্কার করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে বিশ্লেষণ যাকে নেতির নেতিকরণ, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং তার বিপরীত – এটা কিন্ত চিরায়ত সত্য। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। অতএব একটা কথা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে যে মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার দায়িত্ব সে মানুষটার নিজেরই। বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষ কারা? বিবেক মনুষ্যত্ব যুক্তিবাদ ন্যায়ের পক্ষে বলিষ্ঠতার সঙ্গে দাঁড়ানো মানুষই বিজ্ঞান মনস্ক তথা যুক্তিবাদী। একজন বিজ্ঞান মনস্ক ও যুক্তিবাদী হলেন কিন্তু ব্যক্তিগত ধান্দার পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরলেন না – এই চিন্তা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী মননের সহায়ক চিন্তা। অর্থাৎ এসম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা পড়ে আমরা এমন ঘটনাই জানতে পারছি যে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার আজও সেভাবে হয়নি।

বিদ্যা হল বহিরাবণ এবং শিক্ষা হল চেতনা সম্পন্ন মনুষ্যত্বের আচরণ। যে বিদ্যা বা শিক্ষায় মনুষ্যত্বের শিক্ষা থাকে না তাকে বিদ্যা বা শিক্ষা বলার কোন মানে থাকে না। এখন প্রশ্ন হলো এই মনুষ্যত্বের শিক্ষা গড়ে কিভাবে? সমাজে সত্যের জন্য সংগ্রাম কোন ব্যক্তিকে উন্নত চরিত্রের স্তরে নিয়ে যায়। নিরন্তর লড়াই চেতনাসম্পন্ন ও মনুষ্যত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্ম দেয়। আমরা ইতিহাসে যেসব বড় মানুষদের দেখতে পাই তাঁদের লড়াইয়ের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সুভাষ চন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, নজরুল, চন্দ্রশেখর আজাদ সহ সমস্ত বিপ্লবীদের লড়াই চিরন্তন রূপে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

বর্তমান সিলেবাসে বিবর্তনবাদকে ঠাঁই দেওয়া হয়নি, মোগল আমল সিলেবাসের বাইরে, পর্যায় সারণীও বাদ পড়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বিজ্ঞান মনস্ক ছাত্র সমাজ গড়ে তোলার প্রতিবন্ধক। এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

ধন্যবাদান্তে
কাজী নাজমুল ইসলাম
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ

অতিথি কলাম ঃ

আলোর গতির মান নির্ণয়ের ইতিহাস

– সরোজ নাগ

আলো সত্যিই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে, এত দ্রুত যে আলোর গতির মান নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে সাধারণত মনে করা হত যে আলো তাৎক্ষণিকভাবে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু মহান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ভাবতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আলোর গতি সসীম হতে পারে। এবং তিনি সেই গতি পরিমাপের জন্য একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। যদিও আমরা জানি না তিনি কখনও বাস্তবিকই সেই পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন কিনা।

* পাহাড় এবং লণ্ঠন – আলোর গতি পরিমাপ করার জন্য গ্যালিলিওর পদ্ধতিটি কেমন ছিল? অন্ধকার রাতে দুটি লণ্ঠন নিন এবং সেগুলিকে একটি বড় দূরত্বে আলাদা করে রাখুন (তবে খুব বেশি দূরে নয় যে আপনি সেগুলি দেখতেই পাবেন না)। দুটি লণ্ঠন দুটি ভিন্ন লোকের হাতে রয়েছে এবং তাদের একটি শাটার রয়েছে যাতে তাঁরা সেগুলি চালু এবং বন্ধ করতে পারেন। এবার ধরা যাক যে আপনি পর্যবেক্ষক থেকে এক বা দুই কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ে একটি লণ্ঠন নিয়ে গেলেন। পরিবেশ এমন হতে হবে যে লণ্ঠনগুলিকে দুজনেই দেখতে পান। এরপর সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে অন-অফ করে সময়ের হিসাব নিয়ে গণনার সাহায্যে আলোর গতিবেগ মাপতে পারবেন।

অবশ্যই এটি আলোর গতি পরিমাপ করার জন্য সঠিক পদ্ধতি নয়। এই পদ্ধতি শব্দের গতি পরিমাপ করতে কাজ করতে পারে, কিন্তু আলোর জন্য নয়। শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিওর আলোর গতির মান ছিল “সত্যিই অন্তত দ্রুত।”

* বৃহস্পতির উপগ্রহ – পরিষ্কার রাতের আকাশে একটা ভালো দূরবীন দিয়ে আপনি বৃহস্পতির অন্তত চারটি উপগ্রহকে পরিষ্কার দেখতে পারেন। সেগুলি হলো আইও, ইউরোপা, গ্যানিমেড এবং ক্যালিস্টো। এই চারটি উপগ্রহের মধ্যে বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে আইও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিওই এই উপগ্রহটিকে আবিষ্কার করেন।

যাইহোক ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওলে রোমার (Ole Roemer) সর্বপ্রথম আলোর বেগ মাপতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বৃহস্পতির চারপাশে আইও-র কক্ষপথকে এই ধরনের নেভিগেশনাল ঘড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন (সঠিক ঘড়ি তৈরি করা এত সহজ ছিল না)। এর সাথে তিনি বৃহস্পতি এবং আইও-র গ্রহণ (eclipse) ও অকাল্টেশন (occultations)-কে ব্যবহার করেছিলেন। এখানে গ্রহণ মানে আইও-র ওপর বৃহস্পতির ছায়া পড়া এবং অকাল্টেশন মানে পৃথিবীর সাপেক্ষে আইও বৃহস্পতির পিছনে চলে যাওয়া।

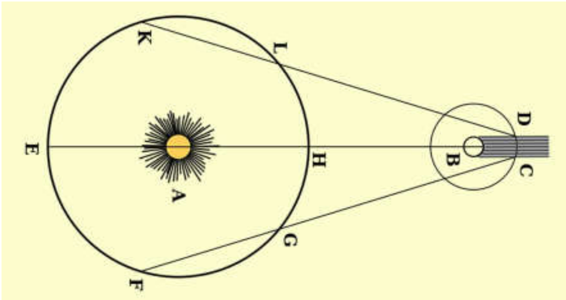

(চিত্র-১) বিজ্ঞানী রোমারের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ

খুব সংক্ষেপে রোমারের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। সঙ্গের ছবিটি লক্ষ্য করুন। (চিত্র-১) এই ছবিতে A হল সূর্য, B হলো বৃহস্পতি, C এবং D যথাক্রমে আইও-এর উপর বৃহস্পতির ছায়া পড়া শুরু এবং বৃহস্পতির পিছন থেকে আইও-এর পৃথিবীর সাপেক্ষে উদয় হওয়া। আর সূর্যের চারপাশে বৃত্তটি হলো পৃথিবীর কক্ষপথ। এর উপরে বিভিন্ন বিন্দু বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থান নির্দেশ করে।

H হল পৃথিবী যখন বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে এবং E হল পৃথিবীর ছয় মাস পরের অবস্থান, বৃহস্পতি থেকে সূর্যের বিপরীত দিকে (E থেকে বৃহস্পতিকে দেখা সম্ভব নয়)। আইও-এর কক্ষপথের সময়কাল জানা ছিল প্রায় ৪২.৫ ঘন্টা। পৃথিবী থেকে দেখা যায়, প্রতি কক্ষপথে একবার উপগ্রহটি বৃহস্পতির পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন আপেক্ষিক অবস্থানে আইও-এর উপরে এই ছায়া পড়ার সময় মাপা হয়।

পৃথিবী যখন E-এর সামান্য কাছে থাকে (যেখান থেকে বৃহস্পতিকে দেখা সম্ভব), তখন আইও-র আলোকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসের প্রায় সমান একটি অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। এর ফলে গ্রহণের সময় দেরী হয়। রোমার এই দেরীর সময়কাল পরিমাপ করেছিলেন। এবার পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাস আগেই জানা ছিলো। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানে শুধুমাত্র আপাত সময়ের পরিবর্তন এবং দূরত্বের পরিবর্তন পরিমাপ করলে আলোর গতির একটি অনুমান পাওয়া যায়। সেখান থেকে হিসাব করে তিনি আলোর গতির মান নির্ধারণ করেছিলেন। বিজ্ঞানী রোমার সেই গতি নির্ধারণ করেছিলেন সেকেন্ডে প্রায় ২১২০০০

কিলোমিটার। বর্তমানে শূন্যস্থানে আলোর গতির মান পাওয়া যায় ২৯৯৭৯২.৪৫৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। রোমারের অনুমানের সাপেক্ষে বলা যায় তখনকার দিনে গ্রহদের দূরত্ব সঠিক ভাবে জানা ছিল না এবং নিখুঁত ঘড়ির অভাব ছিল। তবুও তিনিই প্রথম শূন্যস্থানে আলোর গতি পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

* নাক্ষত্রিক বিচ্যুতি (stellar aberration) – ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে জেমস ব্র্যাডলি সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তন গতির কারণে দূরের নক্ষত্রের অবস্থানের আপাত স্থানচ্যুতি হওয়ার জন্য তারার বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করে আরেকটি অনুমান করেছিলেন। তিনি ড্রাকো নক্ষত্রপুঞ্জের (Draco constellation) একটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখতে পান যে সারা বছর ধরে এর আপাত অবস্থান পরিবর্তিত হয়। সমস্ত তারার অবস্থান এইভাবে সমানভাবে প্রভাবিত হয়। ব্র্যাডলি নক্ষত্রের আলোর এই বিচ্যুতি কোণটি পরিমাপ করেছিলেন। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর গতি তাঁর জানাই ছিলো। সেখান থেকে হিসাব করে তিনি আলোর গতির মান নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর পাওয়া আলোর গতির মানটি হল ৩০১,০০০ কিমি/সেকেন্ড, যা বর্তমান মানের অত্যন্ত কাছাকাছি।

* খাঁজ কাটা ঘূর্ণায়মান চাকা – আলোর গতি নির্ণয় করার জন্য এতদিন বিজ্ঞানীরা মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু ১৮৪৯ বিজ্ঞানী আরমান্ড ফিজেউ (Armand Fizeau) একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের পরীক্ষা করেন।

তিনি ৪ কিলোমিটার দূরে একটি আয়না থেকে প্রতিফলিত আলোর রশ্মি ব্যবহার করেছিলেন। রশ্মিটি একটি দ্রুত ঘূর্ণায়মান চাকার খাঁজের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। চাকার গতি ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছিল যতক্ষণ না এর গতি এমন ছিল যে আলোর দ্বিমুখী পথটি (অর্থাৎ উৎস থেকে যাওয়া এবং প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে) চাকার পরিধির একটি খাঁজের গতির সাথে মিলে যায়। এই পরীক্ষায় আলোর গতির মান পাওয়া গিয়েছিল ৩১৫,০০০ কিমি/সেকেন্ড। পরে বিজ্ঞানী লিওন ফুকো (Leon Foucault) এই পরীক্ষাটিই ঘূর্ণায়মান আয়না ব্যবহার করে সম্পাদন করেছিলেন। সেই পরীক্ষায় আলোর গতির মান পাওয়া যায় সেকেন্ডে ২৯৮,০০০ কিরোমিটার। তার সাথে আলোর বাতাসের চেয়ে জলে ধীর গতিতে ভ্রমণ করে এই তথ্যটি এই পরীক্ষার পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়।

* পরের ঘটনা – ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মাইকেলসন শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তাঁর গবেষণার ফলে আলোর গতি পাওয়া যায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৯৯,৯০১ কিলো মিটার। সেই পরীক্ষায় তিনি এমন অভূতপূর্ব নির্ভুলতার সাথে আলোর গতি পরিমাপ করেছিলেন যে তাকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell) তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব প্রকাশ করার পর সরাসরি আলোর গতি নির্ণয় করার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে আলোর গতি গণনা করা সম্ভব হয়েছিল। এই বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছিল তবে তখনকার দিনে সবচেয়ে নিখুঁত মান বের করতে পেরেছিলেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রোজা এবং ডরসি। তাঁরা শূন্যস্থানে আলোর গতি নির্ণয় করেছিলেন প্রতি সেকেন্ডে ২৯৯,৭৮৮ কিমি। তার পরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে আমরা শূন্যস্থানে আলোর গতির নিখুঁত মান পেয়েছি। এরপর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ফ্রুম (Froome) আরও নিখুঁত মান নির্ধারণ করেন। তিনি শূন্যস্থানে এক সেকেন্ডের ১/২৯৯,৭৯২,৪৫৮ ভাগ সময়ের ব্যবধানে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে, সেই দূরত্বকে এক মিটার বলা হয়। এইভাবে আজকের শূন্যস্থানে আলোর গতির মান নির্ধারিত হয়েছে। ■

তথ্যসূত্র –

১। Twentieth Century Physics, Vol-2, IOP/AIP press.
২। American Museum of Natural History.
৩। Wikipedia.

চিত্র পরিচিতি – রেখাচিত্রটি William Francis Magie-এর লেখা A Source Book in Physics, 1st ed. এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। রেখাচিত্রটি উইকিপিডিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

চোখ – আমাদের মনের জানালা

– শুভময় দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত Optometrist

(দ্বিতীয় অংশ)

একজন বলেছিলেন, "চোখকে কখনও খারাপ পথের দিকে ধাবিত কর না, এতে আখেরে ক্ষতি তোমারই।" গভীর অর্থবহ এই উক্তিটির সামান্য হেরফের করে বলি "চোখকে কখনও গাফিলতি করে খারাপ করো না, এতে আখেরে ক্ষতি তোমারই।

আগের সংখ্যায় আমরা মূলত চোখের কর্নিয়া অংশের উপর আলোচনা করেছিলাম। আলো প্রতিসরণের ক্ষেত্রে চোখের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল লেন্স। কর্নিয়াতে প্রতিসারিত হয়ে আলোকরশ্মি পরবর্তী যে অংশের উপর পরে তা হল লেন্স।

লেন্স গঠনে উভোত্তল। এখানে আলোকরশ্মি দ্বিতীয়বার প্রতিসারিত হয়ে চোখের ভিতরের সবচেয়ে সংবেদনশীল পর্দা রেটিনাতে পড়ে। সুতোর মত দেখতে সিলিয়ারী মাসল গোলাকার লেন্সকে চোখের প্রায় মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখে। এই সিলিয়ারী মাসলগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। খুব সামনের কোনও আলোকিত বস্তু থেকে আলো যখন লেন্সের মাধ্যমে প্রতিসারিত হয় তখন সেই আলো দূর থেকে আসা আলোর থেকে খানিকটা পৃথক হয়। দূর থেকে আলোর রশ্মি সমান্তরাল থাকে। চোখের ভেতরে যে লেন্স থাকে তা উভোত্তল লেন্স। সমান্তরাল আলোকরশ্মি প্রতিসারিত হয়ে এক বিন্দুতে মিলিত হয়। তা রেটিনা বা পর্দার উপরে পড়ে। সেখানে উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। সেটি অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সোজা অনুভূত হয়। আমরা দেখতে পাই। কিন্তু খুব কাছের থেকে আলোকরশ্মি যখন লেন্সে এসে পড়ে তা সমান্তরাল না হওয়ার জন্য বিন্দুতে মিলিত হয়ে রেটিনায় পৌঁছায় না। তখন সিলিয়ারী মাসল নিজে থেকেই খানিকটা লেন্সকে বাঁকা করে আলোকরশ্মিগুলোকে এক বিন্দুতে ফোকাস করে রেটিনায় ফেলে দেয়। তাতে বই বা মোবাইলের লেখা কাছ থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। একে বলে অ্যাকোমোডেশন।

চল্লিশে চালশে এবং করনীয়

চল্লিশে চালশে কথাটা আমাদের মধ্যে খুব চালু। আসলে চল্লিশ বছরের কাছাকাছি বা পর থেকে এই সিলিয়ারী মাসলের অ্যাকোমোডেলন করার ক্ষমতা কমে আসে। সেক্ষেত্রে কাছের ছোট জিনিস, লেখা দেখতে অসুবিধা হয়। একে বলে চালশে বা প্রেসবায়োপিয়া।

চিকিৎসায় চশমা

চালশে বা প্রেসবায়োপিয়া হলে প্লাস পাওয়ারের বাইফোকাল চশমা দিয়ে এই ত্রুটি সংশোধন করতে হয়। একশজন মানুষের মধ্যে পঁচাশি জন মানুষেরই চশমার প্রয়োজন হয়। এটা চোখের কোনও রোগ নয়। বয়সজনিত পরিবর্তন। অনেকে এইসময় লজ্জায় চশমা ব্যবহার করতে চান না। কিংবা মনে করেন সবাই বয়স বুঝে যাবে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধার সাথে সাথে চোখ লাল হওয়া বা মাথার যন্ত্রণা অনুভব করেন। তাই ক্লিনিকগুলোতে অনেক রুগী আসেন যারা পেশায় দর্জি বা সেলাইয়ের কাজ বা সুক্ষ্ম লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত। তাদের এই অসুবিধার কারণে অনেকেই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ রোজগারের সুযোগ হারান। এক্ষেত্রে চক্ষু পরীক্ষা করে একটা চশমাই তাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। জাতীয় অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচীতে সরকারী হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পঁয়তাল্লিশের বেশি বয়সীদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করে চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের চোখ মূলত কর্নিয়া ও লেন্সের মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ হয়। স্লেলের চার্ট ব্যবহার করে মানুষের আলাদা আলাদা চোখের দৃষ্টিশক্তি মাপা হয়। আলোকরশ্মি প্রথম কর্নিয়ার ওপর এসে পড়ে। তারপর লেন্সের মাধ্যমে রেটিনায় পৌঁছয়। তখন আমরা দেখতে পাই। রেটিনাতে এক বিন্দুতে মিলিত হলে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। কারও যদি কর্নিয়ার কার্ভেচার বেশি হয় তবে প্রতিসরণের গুরুতর ত্রুটি দেখা যায়। কারও যদি চক্ষুগোলক লম্বায় সামান্য বৃদ্ধি পায় তবে আলোকরশ্মি রেটিনার আগেই মিলিত হয়ে যায়। তখন মানুষ ঝাপসা দেখে। একে বলে ক্ষীণ দৃষ্টি বা মায়োপিয়া। চোখের সামনে অবতল লেন্স (মাইনাস পাওয়ারের) দিলে আলোকরশ্মিকে ঠেলে একটু দূরে সরিয়ে রেটিনাতে পতিত করে। তখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। আবার চক্ষুগোলক যদি একটু ছোট হয়ে যায় তবে আলোকরশ্মি রেটিনার পিছনে গিয়ে পড়ে (হাইপার মেট্রোফিয়া বা দীর্ঘ দৃষ্টি)। এক্ষেত্রে চোখের সামনে উত্তল (প্লাস পাওয়ারের) লেন্স স্থাপন করলে তা রশ্মিকে এগিয়ে এনে রেটিনাতে পৌঁছে দেয়। আবার রশ্মি নানারকম কোণে এসে মিললে অ্যাসটিগামাটিজিম হয়। তখন সিলিনড্রিক্যাল প্লাস বা মাইনাস পাওয়ারের চশমা ব্যবহারের ফলে এই সমস্যা সংশোধিত হয়। অনেকের ধারণা আছে প্লাস পাওয়ার কাছের জন্য আর মাইনাস পাওয়ার দূরের জন্য। কিন্তু এটি ঠিক নয়। দূরের জন্য প্লাস বা মাইনাস দুটোই লাগতে পারে। কিন্তু আগে উল্লেখ করা চালশে বা প্রেসবায়োপিয়া সংশোধনে শুধুমাত্র প্লাস পাওয়ারই লাগে। তা দূরের পাওয়ারের সঙ্গে যোগ করে বাইফোকাল চশমা করা হয়। যার উপর দিকে দূরের আর নীচের অংশ কাছের দৃষ্টির ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনেকেরই বোর্ডের লেখা দেখতে অসুবিধা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেকেই তাদের অমনোযোগী ছাত্রছাত্রী ভেবে নেন। কিন্ত ঠিক মতো চশমা পড়লে তাদের এই অসুবিধা দূর হয়। তাই সব সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে সব শিক্ষার্থীদের বছরে একবার করে চোখ পরীক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। ছোট বয়সে দৃষ্টির ত্রুটি ধরা না পড়লে পড়াশোনার যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। আর একটা সমস্যা হল দুই চোখের মধ্যে কোনও চোখে হয়তো সঠিক দৃষ্টি আছে কিন্তু অন্য চোখে কম দেখে, এক্ষেত্রে দুই চোখ একসঙ্গে ব্যবহার করার জন্য এই ত্রুটি (অলস চোখ বা

➔

পরিবেশবাদ ও পরিবেশ বিজ্ঞান (ষষ্ঠ পর্ব) ঃ

কৃষিতে সার, কীটনাশক প্রয়োগ-পরিবেশে প্রভাব ও প্রতিকার

(প্রথম ভাগ)

গত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে মনুষ্য-কার্যকলাপজনিত বিশ্ব-উষ্ণায়ণের তত্ত্বটির জন্ম হয় ও আশির দশকে তা জনসমক্ষে উত্থাপিত হয়। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিষয় যথা জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, সমুদ্রের জলদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, রাসায়নিক দূষণ, বরফের অতিগলন, অতিপ্লাবন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ব-উষ্ণায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। বলা হল এই বিশ্ব-উষ্ণায়ণ যতটা না প্রাকৃতিক তার থেকে বেশি মনুষ্য কার্যকলাপজনিত, তাই পরিবেশের মধ্যে ঘটে চলা এই 'অনাকাঙ্ক্ষিত' পরিবর্তনগুলির দায় মানুষের। এই পরিবর্তনগুলি এত দ্রুতহারে ঘটে চলেছে যে মানুষের এর সাথে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছে ও আগামীদিনে মানুষের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। এই তত্ত্ব পরিবেশবাদ-এর জন্ম দিয়েছে যা বহুলাংশে পরিবেশ বিজ্ঞানের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলির বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। একদিকে, বিশ্বজুড়ে পরিবেশবাদীরা এই তত্ত্বের সপক্ষে প্রচার করছেন অন্যদিকে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মানুষকে বিজ্ঞানের আলোকে সচেতন করার প্রয়াস রাখছেন। মনুষ্য কার্যকলাপজনিত কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ণ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের বিপন্নতা ইত্যাদির পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে পরিবেশ দূষণের তত্ত্ব। এই আলোচনা কৃষিতে সার, কীটনাশক প্রয়োগ এবং পরিবেশে তার প্রভাব ও প্রতিকারে সীমাবদ্ধ থাকবে।

পরিবেশবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী,

* জমিতে লাগাতার সার ব্যবহারের ফলে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়।

* ফল-সব্জীর খাদ্যগুণ বিনষ্ট হয় বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

* সার মিশ্রিত মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে নিকটবর্তী পুকুর, নদী, নালার জলকে দূষিত করে ফলে মাছ চাষের ক্ষতি করে।

* সার প্রয়োগের ফলে মাটি, জল এমনকি বায়ুকেও দূষিত করে, কারণ এর ফলে বায়ুতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়।

জমিতে পোকা ও আগাছা মারার জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করা

➔

●*চোখ – আমাদের মনের জানালা*

অ্যামব্লায়োপিয়া) ধরা পড়ে না। অনেক পরে দৃষ্টি পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়লে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায়। তখন খুব একটা কিছু করার থাকে না। ত্রুটিযুক্ত চোখ অলস হয়ে যায়। পাওয়ার দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত করা যায় না। তাই সকলেরই একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর আলাদা আলাদা ভাবে দুই চোখ পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন।

অনেকের চোখে খুব বেশি পাওয়ারের চশমার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে খুব মোটা কাঁচের চশমা ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে কনটাক্ট লেন্স ব্যবহারে সমস্যার নিরসন হয়। কিন্তু এই লেন্স একটানা দীর্ঘসময় ব্যবহার করা যায় না। একটানা প্রায় চার ঘন্টা ব্যবহারের পর খুলে রাখতে হয়। ওইসময় আবার চশমা পরে নিতে হয়। আউটডোর খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে কনটাক্ট লেন্স খুবই উপকারী। কারণ চশমা পরে ছোটাছুটি করা খুবই অসুবিধাজনক।

"জীবন আপনার চোখের পলকের চেয়েও দ্রুতগামী। তাই সময় থাকতে সব ঠিক করুন।" বিখ্যাত গীতিকার, গীটারিস্ট ও গায়ক জিমি হেন্ড্রিক্স এর এই উক্তি সকলের মেনে চলা উচিৎ। সময় পেরিয়ে গেলে আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় উপদেশ

১) চোখের সামান্যতম অসুবিধা হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ। গাছগাছড়া বা হাতুড়ে পরামর্শ মতো ওষুধ চোখে দেওয়া উচিৎ নয়।

২) শুয়ে শুয়ে পড়া, চলন্ত যানে পড়তে পড়তে যাওয়া এবং কম আলোতে পড়া উচিৎ নয়।

৩) এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় না পড়ে মাঝে মধ্যে চোখকে বিশ্রাম দেওয়া উচিৎ।

৪) পরিস্কার জল দিয়ে চোখ পরিস্কার করা উচিৎ। চোখ ধুলোবালি থেকে রক্ষা করা দরকার এবং নোংরা হাত চোখে দেওয়া উচিৎ নয়।

৫) খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখা উচিৎ নয়। ■

হয় তা যেহেতু বিষাক্ত, তাই এর ফলে প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কীটনাশক ও আগাছানাশকের প্রয়োগ ফসলকেও দূষিত করে ফলে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে দূরারোগ্য ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল, সার,কীটনাশক, আগাছানাশক হিসাবে জমিতে জৈব পদার্থের সার্বিক ব্যবহারের প্রচলন করা ও ধীরে ধীরে কৃত্রিম (পরিবেশবাদীদের ভাষায় রাসায়নিক) সারের ব্যবহার কমিয়ে আনা।

আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা দরকার, সার, কীটনাশক, আগাছানাশক তা সে জৈব বা অজৈব যাই হোক না কেন এগুলি সবই রাসায়নিক পদার্থ। রসায়ন শাস্ত্রে সমস্ত পদার্থ (জল, বায়ু, মাটি, পর্বত, বৃক্ষ) মাত্রেই রাসায়নিক। উৎসগতভাবে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় – ১) জৈব পদার্থ অর্থাৎ যা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ থেকে প্রাপ্ত ও ২) অজৈব পদার্থ অর্থাৎ যা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ ব্যতীত অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত। মানুষ কৃষিকার্যে সারের উপকারিতা আবিষ্কার করার পর অবচেতনভাবেই জৈব ও অজৈব দুই প্রকার সার ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তীকালে, কৃত্রিম উপায়ে সার, কীটনাশক ইত্যাদির শিল্প-উৎপাদন শুরু হয়। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত পদার্থগুলিকে 'রাসায়নিক' নামে ডাকা শুরু হয় যা অবৈজ্ঞানিক তাই ভ্রান্ত। এই রচনায় সার'কে জৈব ও অজৈব এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও শিল্পে উৎপাদিত সার'কে কৃত্রিম সার বলা হয়েছে।

এই সংখ্যায় কৃষিতে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ ও পরিবেশে তার প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়টির উপর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার প্রয়াস রাখা হল। উক্ত বিষয়টির বিস্তার শুধুমাত্র সারের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং কৃষি অর্থনীতি তথা কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কৃষিকার্য-এর প্রবর্তন ও তার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনার দাবি রাখে।

পৃথিবীতে কৃষির প্রচলন ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আজ থেকে প্রায় ১১৮০০ বছর আগে কৃষিকাজের সূচনা করে মানুষ। ভূতাত্ত্বিকদের কাছে এই সয়মকালটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময় পৃথিবীতে শেষ বরফ যুগ (প্লাইসটোসিন আইস এজ) এর সমাপ্তি ঘটে। মহাদেশগুলিতে (প্রথমে নিরক্ষরেখা সংলগ্ন এবং তারপর ক্রমশ উচ্চ দ্রাঘিমা অঞ্চলে) বরফের গলন প্রচুর জলাভূমির সৃষ্টি করে, নদীগুলিতে জলের ধারা বাড়তে থাকে এবং নদীর ক্ষয়কার্যে পলিমাটির আস্তরণ সৃষ্টি হয়, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে উষ্ণ ও আর্দ্র হয়। সেই সময় কৃষির প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা। এর আগের অধ্যায়ে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ মূলতঃ যাযাবর জীবন যাপন করত। পশু শিকার, মাছ শিকার, গাছের ফল ও মাটির নীচের কন্দমূল সংগ্রহ করে তা দিয়ে খাদ্যের চাহিদা মেটাত। যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বাসভূমিতে বসবাস শুরু করার আগের প্রায় ষাট হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতির সাথে লড়াই করেছে নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার তাগিদে। ঐ সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক পর্বে মানুষ প্রকৃতিকে সেই ভাবে ব্যবহার করতে পারেনি, তবে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞানলাভ করে প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করে ও বিকশিত করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই অভিজ্ঞতালবদ্ধ জ্ঞান প্রকৃতিকে আরও বিশদভাবে জানার ও প্রকৃতির নিয়মগুলি আবিষ্কারের ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করেছে। স্থায়ী বাসভূমিতে বসবাস শুরু করার পর প্রয়োজন হল স্থায়ী খাদ্য যোগানের। এই চাহিদাই মানুষকে ঠেলে দেয় কৃষি কাজে। যাযাবর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির পরিচয় ঘটেছিল বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সঙ্গে। এবার কৃষিকর্মে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করা শুরু হল। চাষবাসের উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করা, জমি কর্ষণের জন্য প্রস্তর কাঠ এবং ক্রমে ক্রমে তামা, ব্রোঞ্জ ও লোহার লাঙ্গল তৈরী করা, বীজ রোপনের উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা, বিভিন্ন পশুকে কৃষিকাজের উপযুক্ত করে পোষ মানানো, ফসল তোলার উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা, ফসল ও বীজ সংরক্ষণ করা, ঋতু পরিবর্তন, জোয়ারভাটা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা – এ সবই মানুষকে শিখতে হয়েছে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার বিকাশের তাগিদে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে এই কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। যেহেতু কৃষির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হল জল, তাই দেখা যায় পৃথিবীব্যাপী সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে নদ-নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। যেমন, নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, মিসিসিপির উপকূল বরাবর মায়া সভ্যতা, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীকূলে মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, ইয়াং সিকিয়াং ও হোয়াং হো নদী তীরে চৈনিক সভ্যতা, সিন্ধুনদের উপকূলে সিন্ধু সভ্যতা, গঙ্গা নদীর অববাহিকায় গাঙ্গেয় সভ্যতা ইত্যাদি।

মানুষের সুদীর্ঘ কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত হওয়া অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মৌখিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে। এই জ্ঞান ছিল সম্পূর্ণভাবে সামাজিক। প্রকৃতিতে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ক্রমান্বয়ে ফিরে ফিরে আসে, এর থেকে ঋতু চক্রের ধারণার জন্ম হয়। ঋতুর পুনরাবৃত্তির মধ্যেকার সময়ের ফারাক থেকে মাস, বছরের ধারণার জন্ম হয় ও বিভিন্ন রকম গণনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পাশাপাশি কোন্ ঋতু কোন্ ফসলের চাষের জন্য উপযুক্ত সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে থাকে। অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষ বুঝেছিল ঋতুর পরিবর্তন সব সময় এক রকম ছন্দে ঘটে না। কখনও অতিবর্ষণ, আবার কখনও খরার কারণে পরিশ্রমের ফসল জমিতেই নষ্ট হয়ে যেত। প্রকৃতির প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব থাকায় প্রকৃতির কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হতো। অন্যদিকে, অসহায়তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল প্রকৃতিকে জয় করার তাগিদ। নদী বাঁধ নির্মাণ ও

জলাধার নির্মাণের সূচনা এইভাবেই ঘটেছিল। কৃষির সাথে যুক্ত মানুষেরা নিরীক্ষণ করেছিল একই জমিতে বার বার চাষের ফলে ফলন ক্রমশঃহ্রাস পায়, আবার বন্যা বিধৌত জমির ফলন পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যায়। জমির উর্বরতা হ্রাস পেলেও প্রাকৃতিকভাবে তা ফিরে আসার কারণ না জানা থাকলেও মৃত্তিকার গুণাবলী ও চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা তৈরী হয়। আবার কখনও জমির ফসল নষ্ট করে দিত পঙ্গপালের দল বা ক্ষুদ্রাকার পোকা-মাকড়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ফসলের ব্যাপক ক্ষতির ফলে দেখা দিত চরম খাদ্যাভাব। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে এই সমস্যাগুলি সমাধানের কোন উপায় থাকত না।

এর সমান্তরালভাবে সমাজে ঘটছিল বেশ কিছু পরিবর্তন। তথাকথিত সভ্য সমাজ প্রবর্তনের পর্যায়ে জায়গায় জায়গায় যে জনগোষ্ঠীগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তা ভেঙ্গে নতুন নতুন জনগোষ্ঠী বা উপ-জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল ও ধীরে ধীরে কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির জন্ম নিল ও ক্রমশঃ তা বিকশিত হতে লাগল। কৃষিকার্য ছাড়াও সমাজে বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে গেলে শ্রমবিভাজন আবশ্যিক হয়ে উঠল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জমি ও অরণ্যের অধিকার নিয়ে লড়াই হত। লড়াইয়ে পরাজিতদের যুদ্ধবন্দী করে দাসে পরিণত করার প্রচলন শুরু হল। যুদ্ধবন্দী দাসদের কৃষিকাজের মত কায়িক পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে বলপূর্বক বাধ্য করা হত। ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব হবার সাথে সাথে ক্রীতদাসেরাও পণ্য হিসাবে পরিগণিত হত। এইভাবে সমাজ ধীরে ধীরে শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদিকে পরশ্রমভোগী দাসমালিক অর্থাৎ শোষকশ্রেণী আর অন্যদিকে শ্রমদানকারী ক্রীতদাস অর্থাৎ শোষিতশ্রেণী। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এই ক্রীতদাসেরা এবং শোষিতশ্রেণীর অন্যান্য কিছু অংশ কালক্রমে কৃষক সম্প্রদায় হিসাবে সমাজে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে সামন্তব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। দাসব্যবস্থা ও সামন্তব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল কেবলই ভোগ। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য হল উৎপাদনজাত পণ্য সামগ্রীকে বাজারজাত করা ও তা বেচে মুনাফা অর্জন করা। বর্তমানে এই পৃথিবীর সর্বত্র এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির করায়ত্তে।

কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের সূচনা

সমাজে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সূচনা পর্ব থেকে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে অভূতপূর্ব উন্নতি হতে থাকে। এই উৎপাদন শুরু হয় সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভে। সামাজিক উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে অতি দ্রুত গতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেথে থাকে, রাতারাতি সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। সেই পরিবর্তনের হাত ধরে পুঁজিবাদী মালিকশ্রেণী শাসন ক্ষতায় আসীন হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোয়ার আসে, কৃষিতেও ঘটে যায় দ্রুত পরিবর্তন। কৃষি সংক্রান্ত যে সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর এতদিন মানুষের কাছে অধরা ছি, বিজ্ঞানের আলোকে এসে তা মূর্ত রূপ ধারণ করল। শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে কৃষি প্রযুক্তির বিকাশ কৃষিকাজকে অনায়াসসাধ্য করে তুলল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকায় সর্বপ্রথম মানব ও পশু চালিত লাঙ্গল-এর পরিবর্তে বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে তৈল-জ্বালানী চালিত, বিদ্যুৎ চালিত, সৌর শক্তি চালিত এমনকি বর্তমানে পারমানবিক শক্তি চালিত যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে কোন কোন দেশে। অন্যদিকে, রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে কৃত্রিম সারের উৎপাদন ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য তার প্রয়োগ, কৃষিজ উৎপাদনকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। অনুর্বর জমিকে অনায়াসে করে তোলা যায় চাষযোগ্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ, অধিক ফলনশীল বীজ, পোকা-মাকড়-এর হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য কীটনাশক, কৃষিজমিতে জল সেচের জন্য মোটর চালিত পাম্প ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির আবিষ্কার ও তার বিজ্ঞানভিত্তিক সফল প্রয়োগ প্রকৃতি-নির্ভর কৃষিব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দিল। বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন, মৃত্তিকা রসায়ন, জীবাণুবিজ্ঞান, পতঙ্গবিজ্ঞান ইত্যাদির বিকাশের উপর ভর করে কৃষিবিজ্ঞান আজ বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। কৃষি মৃত্তিকার গুণমান নির্ণয়, সার ও কীটনাশকের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগ, অপুষ্টিজনিত উদ্ভিদ রোগ ও তার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিকার এসবই আজ কৃষিবিজ্ঞানের করায়ত্তে। তাই মৃত্তিকা কি, মৃত্তিকার উপাদান কি কি, সারের প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়গুলি রচনার স্বার্থে আলোচনা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

মৃত্তিকা কি?

ভূত্বকের উপরিভাগের নরম আবরণ হল মৃত্তিকা। মৃত্তিকার গঠনগত ও উপাদানগত বৈশিষ্ট্য সদা পরিবর্তনশীল। প্রাচীন পৃথিবীর ভূত্বক ছিল বিভিন্ন প্রকারের পাথর দ্বারা আবৃত। কঠিন শিলাস্তর বায়ু ও জলের সংস্পর্শে এসে দীর্ঘ প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যথা ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এবং তা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে সৃষ্টি হয় মৃত্তিকা বা মাটি। ভূত্বকের এই পাতলা ও নরম আবরণ হল উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সহায়ক। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন বর্তমান পৃথিবীর ভূস্তরের মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে এবং এর সর্বাধিক বয়স হলোসিন যুগের সূচনাকাল বা বরফ যুগের সমাপ্তিকাল বা ১১৭০০ বছর। এর অতীতকালে পৃথিবীতে সৃষ্ট

মাটি পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে মৃত্তিকার উপাদানগত ও বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া আবার পৃথিবীর সকল স্থানে সমান নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু অর্থাৎ তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি ও মাটির নীচের ভূতত্ত্বীয় বৈশিষ্ট্য-এর উপর এই প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন ভূত্বকে যেখানে গ্রানাইট শিলা রয়েছে সেখানে মৃত্তিকায় $\underline{K}^{+}, Al^{+3}$ আয়ন বেশি এবং যেখানে ব্যাসল্ট শিলা রয়েছে সেখানে মৃত্তিকায় Fe^{+2}, Mg^{+2} আয়ন বেশি। বিশিষ্ট রুশ বিজ্ঞানী ভি ভি ডকুচেভ হলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্তিকা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক সমূহকে চার ভাগে ভাগ করেন, সেগুলি হল জলবায়ু, জীবজগৎ, আদিশিলা ও সময়। পরবর্তীকালের মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা ভূ-প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রক হিসাবে পরিগণিত করেছেন ফলে বর্তমানে নিয়ন্ত্রকের সংখ্যা পাঁচ। তবে এগুলির মধ্যে জলবায়ু ও জীবজগৎ হল সক্রিয়তম নিয়ন্ত্রক। ভূত্বকের উপরিতলে মৃত্তিকার প্রধান উপাদানগুলি উপস্থিত থাকলেও, উপাদানগতভাবে মৃত্তিকাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। কঠিন মৃত্তিকা স্তর, মৃত্তিকা দ্রবণ স্তর ও পরিবেশগত স্তর (বায়ুমন্ডল, জলমন্ডল ও জীবমন্ডল)। এই তিন স্তরের মধ্যে রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন সক্রিয় যোগাযোগ। মৃত্তিকার দ্রবণ স্তরটি আবার তিনটি স্তরে বিভক্ত। যেমন, ১) সর্বোচ্চ স্তর বা হিউমাস স্তর – এই স্তরটি মৃত্তিকার সবচেয়ে নরম অংশ। বায়ুমন্ডলের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকা এই স্তরটি জৈব পদার্থের বিপুল আধার তাই এটি মৃত্তিকার উর্বরতম স্তর। উদ্ভিদ ও জীব দেহের পচন বা বিয়োজনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন পদার্থের কালো রঙ-এর এই মিশ্রণকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ভাষায় হিউমাস বলা হয়। ২) টপসয়েল বা কর্ষণীয় জমি – এই স্তরটি উর্বর। বিভিন্ন প্রকার উপকারী অনুজীব ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ এই স্তরটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। বীজ বপনের পূর্বে এই স্তরের মৃত্তিকাকে কর্ষণ করে হিউমাস স্তরের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটানো হয় ও আলগা মৃত্তিকার মধ্যে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। ৩) সাবসয়েল বা অন্তর্মৃত্তিকা – এই স্তরের উর্বরতা বৃদ্ধিতে কেঁচোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত উদ্ভিদের শিকড়, পাতা ইত্যাদি থেকে কেঁচো পুষ্টি সংগ্রহ করে ও হিউমাস তৈরী করে। অন্যদিকে, কঠিন মৃত্তিকা স্তরকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, ক) বিচূর্ণ শিলা বা আবহাওয়ার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা – এই স্তরটি অন্তর্মৃত্তিকার ঠিক নীচের স্তর। এটি খনিজ পদার্থের অফুরন্ত ভান্ডার হলেও হাতেগোনা কয়েকটি বৃক্ষ ছাড়া কোন উদ্ভিদের শিকড় এই স্তরে পৌঁছতে পারে না। খ) শক্ত নীরেট শিলা স্তর বা বেডরক – এই স্তরটি নব্য প্রস্তর দ্বারা গঠিত। আলোচিত ভূগর্ভস্থ স্তরগুলি পরস্পর পরিবর্তনশীল যা পৃথিবীর ভূগর্ভে ঘটে চলা প্রস্তর চক্রের বিভিন্ন পর্যায়।

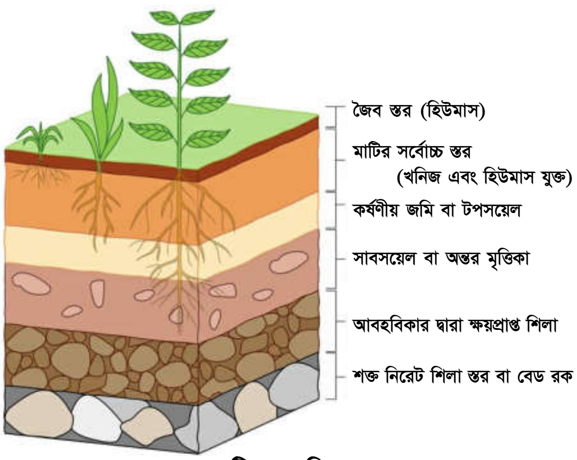

মাটির স্তর বিন্যাস

মৃত্তিকার উপাদান

মৃত্তিকার উপাদান ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন। নদ-নদীর অববাহিকার সমতল অঞ্চলের মৃত্তিকার গুণগত মান উচ্চমানের ও কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত তাই কৃষিভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ এই সমস্ত অঞ্চলে দেখা যায়। সাধারণভাবে কৃষি কাজের জন্য আদর্শ মৃত্তিকার গড় উপাদান হল, ৪৫% খনিজ বা অজৈব পদার্থ (অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতু ও অধাতু দ্বারা সৃষ্ট আয়নীয় যৌগ যা জলে দ্রবীভূত হয়ে বিভিন্ন আয়নে বিয়োজিত হয়), ৫% জৈব পদার্থ অর্থাৎ হিউমাস, ২০-৩০% জল ও ২০-৩০% বায়ু। তবে, বিভিন্ন ফসলের জন্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন।

উদ্ভিদের পুষ্টির মৌলিক উপাদানগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তা হল ঃ ১) অত্যাবশ্যকীয় বা মুখ্যপুষ্টি উপাদান যেমন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার। যার মধ্যে উদ্ভিদ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংগ্রহ করে প্রধানতঃ জল ও বায়ু থেকে। ২) গৌণপুষ্টি উপাদান যথা ঃ নিকেল, সিলিকন, ভ্যানাডিয়াম ও সেলেনিয়াম। মুখ্য পুষ্টি উপাদানগুলি গাছের পুষ্টির জন্য অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে, গৌণপুষ্টি উপাদানগুলি কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়। পুষ্টি উপাদানগুলির মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন প্রধানতঃ উদ্ভিদ দেহের গঠনগত কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন, ফ্যাট, ও শর্করা জাতীয় পদার্থে প্রধান উপকরণ হল এই মৌলগুলি। পুষ্টি উপাদানগুলির অধিকাংশ মৃত্তিকার মধ্যে লবণের দ্রবণরূপে সঞ্চিত থাকে ও উদ্ভিদ তার শিকড়ের মাধ্যমে আয়ন হিসাবে শোষণ করে। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তিতে মাটি পরীক্ষা করে তাতে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। সঠিক ও পর্যাপ্ত ফলনের জন্য এই উপাদানগুলি সঠিক মাত্রায় মাটিতে উপস্থিত থাকা দরকার এবং তা জমির এক

ফুট গভীরতার মধ্যেই থাকা দরকার। কারণ অধিকাংশ শস্যের ক্ষেত্রেই উদ্ভিদের শিকড় সর্বাধিক এক ফুট গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আবার, এই পুষ্টি-উপাদানের পরিমাণ প্রাকৃতিক কারণে কখনো স্থির থাকে না। বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে গেলে বা একই জমিতে কয়েকবার চাষ করা হলে মৃত্তিকার উপাদান কমে যায় ও মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পায়। তাই পরবর্তী চাষের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটানো প্রয়োজন। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে একই জমিতে কয়েকটি চাষের পর, বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পর নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতো অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় ও পটাশিয়ামের পরিমাণ প্রায় ২৫% হ্রাস পায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, তা সে জৈব, অজৈব বা কৃত্রিম সার যাই হোক না কেন।

সারের ইতিকথা

ইতিহাসবিদেরা বলেন নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য অস্থিভস্ম, কাঠের ছাই ইত্যাদি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেটাই ছিল কৃষিতে সার ব্যবহারের প্রথম পদক্ষেপ। জমিতে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নাইট্রোজেন(এন), ফসফরাস(পি) ও পটাশিয়াম(কে) এর প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবা হয়। সারের মধ্যে ঐ মৌলগুলির উপস্থিতির মাত্রা কে 'এন-পি-কে মাত্রা' অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাণীজ অস্থিকে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সুপারফরফেট বানিয়ে তা জমিতে প্রয়োগ করার রেওয়াজ ছিল। পরবর্তীকালে উদ্ভিদদেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের চাহিদা মেটানোর জন্য ফসফেট গঠিত প্রস্তরচূর্ণ ও কপ্রোলাইট বা জীবাশ্মীভূত প্রাণী দেহের মল-এর ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীতে প্রথম পটাশিয়াম সারের শিল্পোৎপাদন শুরু হয়। নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রথমে উদ্ভিজ সার ব্যবহার করা শুরু হলেও ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ক্যালসিয়াম নাইট্রেট লবণের শিল্প-উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অ্যামোনিয়ার শিল্প-উৎপাদন শুরু হলে বিভিন্ন রকমের নাইট্রোজন সারের ব্যবহার হয়। এর মধ্যে ইউরিয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকরী। সার সাধারণত তিন রকমের, জৈব, অজৈব ও মিশ্র।

উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জমিতে সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে। বিশ্বের কয়েকটি দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চল, কানাডা ও ইউরোপ কয়েকটি দেশ চীন, ইসরায়েল ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও কৃষি বিজ্ঞানের অনুশাসন মেনে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হয়নি। অন্যদিকে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে অধিকাংশই ছোট ছোট জোতে ক্ষুদ্র মালিকানায় কৃষিব্যবস্থা টিঁকে রয়েছে। এই দেশগুলি বিশ্বের প্রায় ষাট শতাংশ সার আমদানী করে ও তা অন্যান্য কৃষি সরঞ্জামের প্রধান বাজার হিসাবে বিরাজ করছে।

কৃষিতে সার ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কুফল

মানুষসহ সমস্ত জীবজন্তুর শরীরের সঠিক পুষ্টির জন্য যেমন সুষম খাদ্যের প্রয়োজন, উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তাই। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন সঠিকমাত্রার পুষ্টি সম্বলিত মৃত্তিকা। আবার বিভিন্ন ফসলের জন্য প্রয়োজন ভিন্ন পুষ্টির ভিন্ন মাত্রা। ধান চাষের জন্য যে মৃত্তিকার প্রয়োজন তা আবার আলু চাষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন নির্দিষ্ট ফসলের জন্য যে যে পরিমান পুষ্টির প্রয়োজন মাটিতে যদি তার থেকে কম বা বেশি পরিমাণে উপস্থিত থাকে তাহলে উদ্ভিদের বিকাশে তা ব্যাঘাত ঘটায়। পুষ্টির পরিমান কম হলে গাছে ফুল-ফলের বিকাশসহ সমস্ত জৈবিক ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত হয়। আবার প্রয়োজনের তুলনায় পুষ্টি অতিরিক্ত থাকলে ধীরে ধীরে মৃত্তিকার গুণমান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও ফলন হ্রাস পেতে থাকে। জমিতে কেঁচো ও উপকারী অণুজীবগুলির কর্মক্ষমতা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মাত্রার তারতম্যের সাথে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এই সকল জীবন-অণুজীবগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ও কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি জমিতে বিভিন্ন পুষ্টিগত উপাদানগুলি কতটা পরিমাণে উপস্থিত রয়েছে তা সঠিকভাবে জানার পরই জমিতে কতটা সার প্রয়োগ করা দরকার তা নির্ণয় করা সম্ভব। প্রতি চাষের আগে মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে প্রতিটি মুখ্য খাদ্য ও অণুখাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয় করা ও সেই মতো সারের পরিমাণ ঠিক করে নেওয়া হল একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা। পাশাপাশি এটা মনে রাখা দরকার যে সকল জীবজন্তু সহ উদ্ভিদকূলও রাসায়নিক পদার্থের তারতম্যের একটা স্তর পর্যন্ত মানিয়ে নিতে সক্ষম, তবে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করতে থাকলে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে বাধ্য। কীটনাশক ও আগাছানাশক হিসাবে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যবহৃত হয় তার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঘটে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। একই কীটনাশক প্রয়োগ করে সমস্ত কীটপতঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নির্দিষ্ট কীট দমন করার জন্য নির্দিষ্ট কীটনাশকের প্রয়োজন। যে কোন রাসায়নিকের অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কীটপতঙ্গ, অণুজীব ইত্যাদির বিরুদ্ধে সহনশীলতার জন্ম দেয় যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আধুনিক বিজ্ঞান সার, কীটনাশক, আগাছানাশকের যথার্থ ও নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে, যা পৃথিবীর কিছু দেশে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতসহ পৃথিবীর সমস্ত দেশে কেন তা প্রয়োগ করা হয় না? (ক্রমশ)

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব ষষ্ঠ অংশ)

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রসায়ন বিজ্ঞানী জন ডালটন Law of multiple proportions (গুণানুপাত সূত্র) দেন। এই সূত্রটিকে বুঝতে একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক দুটি মৌল কার্বন এবং অক্সিজেন। পরিমাপ করে দেখা গেছে 3 ভাগ ওজনের কার্বন ৪ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। যদিও 3 ভাগ ওজনের কার্বন 4 ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়। এই সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন যে বিভিন্ন পরিমাণের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, তা সব সময় পূর্ণসংখ্যায় হচ্ছে। দুই ক্ষেত্রে অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত সরল অনুপাত। কার্বন ডাই অক্সাইডে থাকা ৪ ভাগ একেবারে কার্বন মনোক্সাইডের 4 ভাগের দ্বিগুণ। এটাই হল গুণানুপাত সূত্রের একটি উদাহরণ। এই সূত্র একেবারে নিখুঁতভাবে পরমাণু সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায়। ধরা যাক আগের উদাহরণটি। কার্বন মনোক্সাইড যৌগে 3 ভাগ ওজনের কার্বন এবং 4 ভাগ ওজনের অক্সিজেন থাকে। অক্সিজেনের পরমাণুগুলি $1\frac{1}{3}$ গুণ কার্বনের পরমাণুর থেকে ভারি হলে বলা যায় কার্বন মনোক্সাইডের একটি অণু তৈরি করতে একটি কার্বন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু লাগে। তারপর বলা যায় কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরিতে 3 ভাগ ওজনের কার্বন এবং ৪ ভাগ ওজনের অক্সিজেন লাগে, কারণ সেক্ষেত্রে এর একটি অণু তৈরি করতে একটি কার্বন এবং দুটি অক্সিজেন পরমাণু প্রয়োজন। যৌগ গঠনে ওজন অনুপাতের সঙ্গে সেই যৌগে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যার ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গুণানুপাত সূত্র যা প্রাউস্টের স্থিরানুপাত সূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, এটি ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্বকে সমর্থন দিল।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ডালটন প্রকাশ করলেন ‘এ নিউ সিস্টেম অফ কেমিকাল ফিলোজফি’ যেখানে তিনি তাঁর পরমাণু তত্ত্ব বিস্তারে আলোচনা করেন। সেই বছরই তাঁর গুণানুপাত সূত্র আরেক ইংরেজ রসায়ন বিজ্ঞানী উইলিয়াম হাইড ওল্লাস্টন সঠিক বলে চিহ্নিত করেন এবং তাঁর পরমাণু তত্ত্বকে সাধারণভাবে গ্রাহ্য তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেন।

ডালটনের পরমাণুবাদ কিমিয়াবিদদের প্রাচীন ট্রান্সমিউটেশন তত্ত্বের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিল বলে মনে হল। এই তত্ত্ব অনুসারে যেকোনো ধাতুকে সোনায় রূপান্তর সম্ভব ছিল। ডালটনের পরমাণুবাদে প্রতিটি মৌলের পরমাণু বিভিন্ন এবং এর কোনো রূপান্তর সম্ভব নয়। কিন্তু একশো বছর পর ডালটনের এই ধারণাও পাল্টাতে হয়েছিল। ডালটনের পরমাণু অবিভাজ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী একশো বছরে মানুষ জেনেছে যে এই পরমাণুও বিভাজ্য, তার অতিপারমাণবিক কণা (Sub atomic particle)-ও আছে। এই অতিপারমাণবিক কণার সংখ্যা পরিবর্তন করা গেলে তা নতুন মৌলেও রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু ডালটনের এই ধারণা বহুদিন টিকে গেছিল।

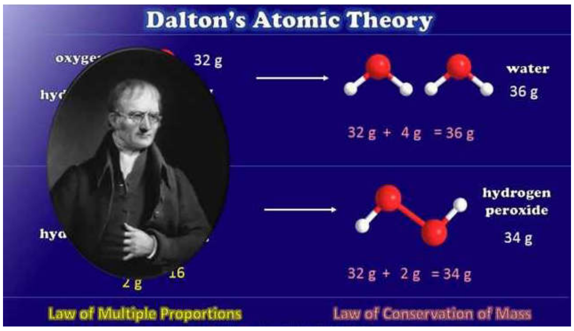

বিজ্ঞানী ডালটনের তত্ত্ব

ডালটনের পরমাণু এতই ছোট যে তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা সম্ভব নয়। তাই তার অপ্রত্যক্ষ পরিমাপ করা সম্ভব। অর্থাৎ অন্য কারোর সাপেক্ষে তার ওজন মাপা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন ৪ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরি করে। যদি কেউ এই ধারণা করে যে একটি জলের অণু একটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত (ডালটন এভাবেই ভেবেছিলেন)। তবে বলতে হয় অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর থেকে 8 গুণ ভারি। যদি হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজনকে এক (1) ধরা হয়, তবে তখন অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ওজন আট (৪) হবে।

আবার একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন, পাঁচভাগ ওজনের নাইট্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করে। যদি অ্যামোনিয়ার অণুকে ধরা হয় একটি হাইড্রোজেন এবং একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর জোড় (ডালটন সেরকমই মনে করতেন) তবে

একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর ওজন হয় পাঁচ (5)। এই নিয়ম অনুসরণ করে ডালটন তাঁর প্রথম পারমাণবিক ওজনের (atomic weights) তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটি ক্রটিপূর্ণ হলেও এটাই ছিল প্রথম পরমাণুর ওজনের ধারণার সূত্রপাত। গুণগত বিচারে পুরানো রসায়নিক বিজ্ঞান একেবারে নতুন চেহারা পেল। এর ক্রটির প্রধান দিক হল দুটি মৌলের পরমাণুর জোড়কে সাধারণত একটি অণু হিসাবে দেখা। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া দুটি ভিন্ন পরমাণুর জোড় বাঁধা অবস্থা থেকে অণুর গঠনের এই কল্পনাতে বাঁধ সাধল তড়িৎ বিশ্লেষণ।

নিকলসন এবং কারলিসলে-এর তড়িৎ বিশ্লেষণে যে আয়তনের অক্সিজেন পাওয়া গেছিল, তা হাইড্রোজেনের আয়তনের দ্বিগুণ ছিল। এমনিতে জানা আছে যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের থেকে হাল্কা। কিন্তু হাইড্রোজেনের বেশি আয়তন এই ধারণার জন্ম দেয় যে তাতে অধিকসংখ্যক পরমাণু বর্তমান।

যেহেতু ঠিক দ্বিগুণ আয়তনের হাইড্রোজেন পাওয়া গেছিল অক্সিজেনের তুলনায় তার ফলে অন্তত যুক্তি অনুসারে বলা যায় জলের একটি অণুতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। এর কম হাইড্রোজেন থাকলে অক্সিজেন পরমাণু বিভাজ্য হতে হবে। এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন যেহেতু আট ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরি করে, তাই যদি হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজন এক (1) ধরি তবে অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ওজন হতে হবে ষোল (16), আট (8) নয়।

নিকলসন এবং কারলিসলের এই আবিষ্কার থেকে উৎসাহ পেয়ে ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী লুইস গে লুসাক দুই আয়তনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক আয়তনের অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল তৈরি করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে যখন গ্যাসগুলি যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে, তখন তারা তা করে পূর্ণসংখ্যার সরল অনুপাতে। গে লুসাক ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর Law of combining volumes বা গে লুসাকের গ্যাস-আয়তন সূত্র প্রকাশ করলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করলেন যে বিক্রিয়ার সময় গ্যাসগুলির আয়তন সরল অনুপাতে থাকে। বিক্রিয়ার পর উৎপন্ন পদার্থ গ্যাসীয় হলে (এখানে জলীয় বাষ্প) তার আয়তনও বিক্রিয়ক গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে সরল অনুপাতেই থাকবে। এই গ্যাসগুলির সরল অনুপাতে সংযোজন থেকে বিক্রিয়ক গ্যাসগুলির এক একটি অণুতে দুটি করে পরমাণু আছে ধরে এবং সমআয়তন সমস্ত গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু আছে – এটা ধরে বলা যায় যে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগে একটি জলের (এক্ষেত্রে জলীয় বাষ্পের) অণু তৈরি হচ্ছে।

যে অ্যামোনিয়া তৈরির রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ওজন অনুপাতে ডালটন ব্যাখ্যা করেছিলেন, গে লুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র (যা আয়তন অনুপাতের সূত্র) দিয়ে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা গেল।

গে লুসাকের সূত্র থেকে এই বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ। এখানে এক আয়তন নাইট্রোজেনের সঙ্গে তিন আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাস যুক্ত হয়ে দুই আয়তন অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। এখানে নাইট্রোজেনের আয়তন ঃ হাইড্রোজেনের আয়তন ঃ অ্যামোনিয়ার আয়তন

$=1:3:2$ (সরল অনুপাতে)

যদি নাইট্রোজেনের একটি অণুতে একটির বদলে দুটি পরমাণুর উপস্থিতি ধরি, যদি হাইড্রোজেনের একটি অণুতে একটির বদলে দুটি পরমাণুর উপস্থিতি ধরি তবে **'যদি সম-আয়তন সব গ্যাসের মধ্যে সমান সংখ্যক অণু আছে'** এটা ধরা হয়, কেবলমাত্র তখনই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজন অনুপাত এবং আয়তন অনুপাতের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব।

যেহেতু 1 আয়তন নাইট্রোজেন +3 আয়তন হাইড্রোজেন =2 আয়তন অ্যামোনিয়া

(ধরি প্রতি 1 আয়তন গ্যাসে n সংখ্যক অণু বর্তমান) তবে বলা যায়

n সংখ্যক নাইট্রোজেন অণু $+3n$ সংখ্যক হাইড্রোজেন অণু
$=2n$ সংখ্যক অ্যামোনিয়া অণু

বা, একটি নাইট্রোজেন অণু + তিনটি হাইড্রোজেন অণু
= দুটি অ্যামোনিয়া অণু

বা, নাইট্রোজেনের দুটি পরমাণু + ছটি হাইড্রোজেন পরমাণু
= দুটি অ্যামোনিয়া অণু

এখন এই পরিস্থিতিতে একটি অ্যামোনিয়া অণু তৈরিতে একটি নাইট্রোজেন এবং তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যায় পরমাণুর অবিভাজ্যতাকে মান্যতা দেওয়া যায়। এর ফলে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ওজন সংশোধিত হয়ে দাঁড়াল $3\times1=3$ (5 নয়)

এইভাবে এক আয়তন হাইড্রোজেনের সাথে এক আয়তন ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের দুই আয়তন গ্যাস তৈরি হয়। এখানেও বলা যায় একটি হাইড্রোজেন অণুর সঙ্গে একটি ক্লোরিন অণুর সংযোজনে দুটি হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অণু তৈরি হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় একটি হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অণু গড়ে উঠেছে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি ক্লোরিন পরমাণুর সমন্বয়ে। এক্ষেত্রে ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন এক (1)।

গে-লুসাকের ধারণাকে **সম-আয়তন সমস্ত গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু** থাকার ধারণায় সমন্বিত করার কৃতিত্ব পাবেন ইতালীয় রসায়ন বিজ্ঞানী আমিদিও অ্যাভোগাদ্রো। তিনি তাঁর এই হাইপোথিসিস বা প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন **১৮১১** খ্রিস্টাব্দে। মনে রাখার বিষয় হল এই যে গে লুসাক ও অ্যাভোগাদ্রোর প্রকল্পে সম-আয়তন গ্যাসে

সমান সংখ্যক অণু থাকবে বলা হচ্ছে। তা হবে যদি গ্যাসের চাপ বা উষ্ণতা স্থির থাকে। কারণ উষ্ণতা বৃদ্ধি বোঝায় গ্যাসের মধ্যে তাপশক্তি বেড়েছে, যা কিনা গ্যাসের অণুগুরিকে অধিকতর শক্তি দিয়ে দূরে ঠেলে দিতে পারে। তখন একই আয়তন গ্যাসে উষ্ণতা বৃদ্ধির আগে যে পরিমাণ অণু থাকবে, উষ্ণতা বৃদ্ধির পর তার পরিমাণ কমে যাবে। একই ঘটনা ঘটবে উষ্ণতা স্থির রেখে (অর্থাৎ তাপশক্তি স্থির রেখে) বাইরে থেকে চাপ বৃদ্ধি ঘটিয়ে অণুগুলিতে বাড়তি গতিশক্তি সৃষ্টি করে। এই সব ঘটনায় বোঝা যায় তাপশক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, বিদ্যুৎ কিংবা রাসায়নিক শক্তি – এগুলো এমনকী স্বালোক সংশ্লেষের আবিষ্কারের পর আলোক শক্তিও একই শক্তির বিভিন্ন রূপমাত্র। প্রত্যেক প্রকার শক্তির রূপগুলি ক্ষুদ্রতম কণার গতি সৃষ্টি করেছে। গেলুসাক বা অ্যাডোগাদ্রো পরমাণুবাদকে সংশোধন করায় রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিতে ঠিক কি হচ্ছে, উপাদানগুলির পরিমাণ কি থাকছে তা পরিষ্কার হল। তবে সমস্তটার মূলে কিন্তু ছিলেন ডালটন।

পারমাণবিক ওজন (atomic weight) সংক্রান্ত ধারণায় অন্যভাবে আলোকপাত করেন ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানী পিয়ের লুই ডুলং এবং ফরাসী পদার্থ বিজ্ঞানী অ্যালেক্সি থেরেসে পেটি। এঁরা একত্রে পারমাণবিক ওজনের সঙ্গে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপের মধ্যকার সম্পর্ক খুঁজে পান। তাঁরা আবিষ্কার করেন যে কোনো পদার্থের আপেক্ষিত তাপ তার পারমাণবিক ওজনের সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতে পাল্টায়। অর্থাৎ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বাড়লে তার পারমাণবিক ওজন কমে যায়। এখানে পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলার যে পারমাণবিক ওজন সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করলেও আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে আমরা এখনো কিছু বলিনি। পদার্থের আপেক্ষিক তাপকে বুঝতে গেলে আপাতত সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে কোনো অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বা গরম বস্তু যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত গরম বা ঠান্ডা হতে গেলে তাকে যথাক্রমে তাপ গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। এই তাপ গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতাই হল বস্তুটির আপেক্ষিক তাপ।

$$\textbf{কোনো বস্তুর আপেক্ষিক তাপ} = \frac{\textbf{বস্তুর দ্বারা তাপ গ্রহণ বা বর্জন}}{\textbf{বস্তুর ভর} \times \textbf{বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস}}$$

এই আপেক্ষিক তাপের সঙ্গে পারমাণবিক ওজনের সম্পর্ক দেখায় তাপ শক্তি ও রাসায়নিক শক্তি বস্তুকণার (এখানে পরমাণুর) গতিময়তার শক্তি।

পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কোনো পদার্থের স্ফটিক বা ক্রিস্টাল অন্য পদার্থের ক্রিস্টালের সদৃশ হতে পারে, তাদের আনবিক গঠনেও সাদৃশ্য দেখা যায়। এই ধর্মকে বলা হয় আইসোমরফিজম (অর্থাৎ একই আকৃতি) এটা আবিষ্কার করেন জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী ইলহাউট মিটসচেরেলিচ (Eilhardt Mitscherlich)। এই দুই বিজ্ঞানীর কাজকে সমন্বয় ঘটাতে এবং পরমাণুবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে আরেকজন বিজ্ঞানীর অবদানকে বাদ দিলে রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তিনি হলেন সুইডিশ রসায়নবিজ্ঞানী জন জেকব বার্জেলিয়াস। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বতন্ত্রভাবে তিনি বিভিন্ন যৌগের প্রাথমিক কণার সন্ধান শুরু করেন। তিনি পারমাণবিক ওজনকে ডালটনের তুলনায় অনেক বেশি পরিশীলিতভাবে নির্ণয় করেন। তিনি ডুলং এবং পেটি ও মিটসচেরলিচ এর সমন্বয় সাধন করে পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করেন। তিনি কিন্তু অ্যাভোগাদ্রোর প্রকল্পকে ব্যবহার না করেই ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে মৌলের পারমাণবিক ওজনের তালিকা প্রস্তুত করেন।

বার্জেলিয়াসের দ্বারা প্রাপ্ত মানগুলি সাধারণভাবে পূর্ণসংখ্যায় ছিল না ডালটনের মতো। এই ছিল দু'জনের পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ে অন্যতম পার্থক্য। এখান থেকে পাঠকরা যদি মনে করেন বার্জেলিয়াসের নির্ণয় থেকে বলা যায় পরমাণু বিভাজ্য, তা কিন্তু নয়। কেননা ডালটনের সিদ্ধান্ত অনুসারে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনকে এক (1) ধরা হয়েছিল। এটা অন্য মানের হলে বা তা পূর্ণসংখ্যা না হলে অন্য মৌলেরও পারমাণবিক ওজন পূর্ণসংখ্যায় নাও হতে পারতো।

পরবর্তী একশো বছরে একাধিক বার বিজ্ঞানীরা নানা উপায়ে পদার্থের পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করেছিলেন, দেখা গেছে বিভিন্ন পদার্থের পারমাণবিক ওজন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনের পূর্ণসংখ্যার গুণিতক নয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামের রসায়ন বিজ্ঞানী জঁ সারভাইস স্টাস অপেক্ষাকৃত নিখুঁত উপায়ে পদার্থের পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করেন। বিশ শতকের শুরুতে আমেরিকান রসায়নবিজ্ঞানী থিওডর উইলিয়াম রিচার্ডস্ সর্বোচ্চ সতর্কতায় ও সূক্ষ্মতায় পদার্থের পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করলেন।

এখন একটা প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা কিছুতেই পাচ্ছিলেন না, তা হল হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনকে এক (1) ধরলে (যেমন ডালটন ধরেছিলেন) অন্য সকল মৌলের পারমাণবিক ওজন কেন পূর্ণসংখ্যায় হবে না? পরীক্ষা লব্ধ ফল অনুযায়ী অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন কিছুতেই এই পদ্ধতিতে পূর্ণসংখ্যার হচ্ছিল না। এমনটা অন্যান্য পদার্থের ক্ষেত্রেও হচ্ছিল। এর কারণ কী পরিমাপ করার সময় ত্রুটি? না পরমাণুর মধ্যে থাকা অতিপারমাণবিক কণার (Sub atomic particles) আবিষ্কার – অর্থাৎ ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন আবিষ্কার হওয়ার পর, তাদের প্রত্যেকের ভর নির্ণয়ের পর পরমাণু সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে গেছিল। দেখা গেছিল একই মৌলের সব পরমাণুর ওজন একই নয়। বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর কারণ, তাতে উপস্থিত নিউট্রন কণার সংখ্যার তারতম্য। এদের ওজনের পার্থক্য থাকলেও, প্রোটনের এবং তার সঙ্গে ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকায় রাসায়নিক ধর্মে অভিন্ন হলেও এদের ওজন আলাদা আলাদা। যেমন উদাহরণ হিসাবে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভিকি এবং জনস্টন নামক বিজ্ঞানীরা

প্রাকৃতিক অক্সিজেনের তিন রকম পরমাণু পেলেন। এদের একত্রে বলে আইসোটোপ এদের বিভিন্ন অনুপাতে বাতাসে পাওয়া যায়। সেই অনুপাতে তাদের ওজনগুলিকে নিয়ে অক্সিজেনের গড় পারমাণবিক ওজন পাওয়া যায়, যা পূর্ণসংখ্যায় হয় না। **কিন্তু মনে রাখার বিষয় কোনো মৌলের একটি আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন কিন্তু ডালটনের ধারণার মতো পূর্ণসংখ্যায়ই হবে।**

ডালটন যেমন হাইড্রোজেনকে ধরে পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ের পদ্ধতি দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে অক্সিজেনকে বা কার্বনকে স্থির ধরেও একই রকম হিসাব হয়েছে। অবশেষে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের সকল রসায়ন বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানীরা একত্রে কার্বনকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে পারমাণবিক ওজন নির্ণয়কে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। এই নতুন স্ট্যান্ডার্ড আগেকার স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।

ডালটন পরমাণুগুলির সংকেতকে বৃত্তের আকারে, তার মধ্যে ল্যাটিন শব্দের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে শুরু করলেও ধীরে ধীরে সাধারণত ল্যাটিন নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে প্রতিটি মৌলের পরমাণুর সংকেত তৈরি হয়। যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার'কে যথাক্রমে প্রকাশ করা হয় C, H, O, N, P, S রূপে। সোনার সংকেত হয় Au (Aurum থেকে নিয়ে), রূপার সংকেত হয় Ag (Argentum থেকে নিয়ে), লেডের সংকেত হয় Pb (Plumbum থেকে নিয়ে)। এবার অণুর সংকেত লেখার পদ্ধতি হয় নির্দিষ্ট মৌলের পরমাণুর সংকেত লিখে তার ডানপাশে একটু নীচে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা লিখে। যেমন জলের সংকেত H_2O (যে পরমাণুর ডানপাশে কিছু লেখা নেই, তাকে একটি পরমাণু ধরতে হবে)। এমন মৌলিক পদার্থের অণুর সংকেত হল Zn (জিঙ্ক), Pb (লেড), O_2 (অক্সিজেন), Cl_2 (ক্লোরিন) ইত্যাদি। প্রতিটি সংকেতের বাঁদিকে থাকা সংখ্যা দেখে বোঝা যাবে, তাতে উপস্থিত অণুর সংখ্যা, এক একটা অণুতে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যাও জানা যাবে। এবার রাসায়নিক বিক্রিয়াকেও লেখা সম্ভব হল, যেমন কার্বনকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ালে হয় কার্বন ডাই অক্সাইড। একে সংকেতের আকারে লেখা সম্ভব হল এমনভাবে – $C + O_2 \rightarrow CO_2$

এখন ল্যাভয়সিয়ের ভরের নিত্যতা সূত্রকে মান্যতা দিলে বলতে হবে বিক্রিয়ার আগে কার্বন, অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা (যা প্রতিটিই পূর্ণসংখ্যা) বিক্রিয়ার পরেও তাই থাকবে। উপরের উদাহরণে তাই দেখা যাচ্ছে।

তাই – $C + O_2 \rightarrow CO_2$ কে লেখা যায় $C + O_2 = CO_2$

কিন্তু কার্বন, অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় যখন কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করে, তখন বিক্রিয়াটির সংকেত $C + O_2 = CO$ লিখলেও ভরের নিত্যতাসূত্র মেনে সমতা আনা যাচ্ছে না। তখন রাসায়নিক সমীকরণটি হবে –

$$2C + O_2 = 2CO$$

এভাবে রাসায়নিক সমীকরণ থেকেই বোঝা গেল বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের আয়তনের সরল অনুপাত 3।

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাবার পর এই পদ্ধতিতে সবথেকে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বিভিন্ন যৌগগুলির উপর এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতকার্য হতে পারছিলেন না। গ্যালভানিক তড়িৎ-কোষের সাহায্যে সোডা ও পটাশ থেকে হামফ্রে ডেভি ধাতুকে আলাদা করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তিনি কঠিন যৌগটিকে গলিয়ে অনার্দ্র অবস্থায় বিশেষ উপায়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ধাতুগুলিকে আলাদা করা সম্ভব হয়। এই তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেমন নতুন মৌলগুলিকে চিহ্নিতকরণ সম্ভব হল, তাদের পারমাণবিক ওজন মাপা সম্ভব হল তেমনি বিদ্যুৎ-এর সম্পর্কে মানব ধারণায় নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল। রসায়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে তা আর আলোচনা করা হল না। নতুন মৌল চিহ্নিতকরণে মানুষ এছাড়া বর্ণালী বিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে, এমনকী নতুন মৌলেরও সৃষ্টি করেছে (এগুলো আবিষ্কার নয়, উদ্ভাবন)।

এই একশো বছরে বা তার অল্প অতিরিক্ত সময়কালে শুধুমাত্র রসায়ন বিজ্ঞান আধুনিক রূপ লাভ করেছিল তাই নয়, একই সময়কালে পদার্থ বিজ্ঞানে নবযুগ এসেছিল তার আণবিক তত্ত্বের সঙ্গে। পদার্থ বিজ্ঞানের আণবিক তত্ত্বও বস্তুজগতের গতিরূপকে তুলে ধরেছিল। এক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র আণবিক স্তরের বস্তুর গতিকে বোঝা সম্ভব হয়েছিল। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস সে সময় লিখেছিলেন – **'এই নতুন পরমাণু বিজ্ঞান আগের অন্যান্য সব কিছু থেকে ভিন্ন এই কারণে যে এই বিজ্ঞান বলে না (নির্বোধেরা ব্যতিক্রম) যে, বস্তু কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একথা বলে যে বিভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলি (ইথার পরমাণুগুলি, রাসায়নিক পরমাণুগুলি, জ্যোতিষ্কমন্ডলী) হলো বিভিন্ন কেন্দ্র বিন্দু (Various nodal points), সেগুলো সাধারণভাবে পদার্থের অস্তিত্বের বিভিন্ন ধরণ নির্ধারণ করে।'**

ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের এই বস্তুজগতের ধারণা এমন এক দর্শন যেখানে আমাদের চারপাশের সকল বস্তুর থেকে চেতনা লাভ করা যায়। এ কারণেই তা বস্তুবাদ। কিন্তু আমাদের চারপাশের এই বস্তুজগত পরস্পর এমনভাবে সম্পর্কিত যে তাদের আলাদা বিচ্ছিন্নভাবে দেখাই সম্ভব নয়, তারা সতত পাল্টাচ্ছে, অর্থাৎ তাদের গতিরূপের স্থানান্তরণ নিরন্তর হয়েই চলেছে। বস্তুজগতের অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের সামগ্রিক পরিবর্তনকে একই

প্রক্রিয়ারূপে একত্রে দেখার দর্শন এই বস্তুবাদ। অজৈব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণকারী এইসব গতির রূপ নিয়ে গবেষণা হল পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিষয় – এইভাবে তিনি বিজ্ঞানকে দেখেছিলেন। জীব-জগতের গতির রূপ সম্পর্কে তখনও অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও তিনি লিখেছিলেন – **'অজৈব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণকারী এইসব গতির রূপ সম্বন্ধে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করার পরই জীবন প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত গতি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা সার্থকভাবে করা সম্ভব।'** তাঁর ধারণায় জীব জগতের প্রতিটি ঘটনাকে রসায়ন ও ভৌতবিজ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান দিয়েই বোঝা সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। আমাদের চারপাশের বস্তুজগতের এই সতত গতিরূপ প্রত্যক্ষ করা যেত না যদি না তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলি, রসায়নে ডালটনের পরমাণুবাদ আবিষ্কার হতো। (ক্রমশ)

সমীক্ষা - ১ ঃ

ভারতের তৃতীয় চন্দ্রাভিযান প্রসঙ্গে জনমত

প্রকৃতি ও সমাজে ঘটে চলা উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আমজনতার ধারণা আগাম নির্ধারণ করা চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান সংগঠনের কাজ হওয়া উচিৎ মানুষের কাছে গিয়ে আলাপ-চারিতার মধ্য দিয়ে তাঁদের মতামত সংগ্রহ করে জ্ঞানার্জন করা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছনো। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ব্যতীত ধারণায় পৌঁছে যাওয়া মৌলবাদের নিদর্শন।

আমরা বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিট, আমাদের সীমিত শক্তি অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে মতামত বিনিময়ের কাজ করে থাকি। এবারে আমাদের বিষয় ছিল চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩ এর অবতরণের বিষয়ে মানুষ কি ভাবছেন তা জানা। এই সম্পর্কে জানতে আমরা আমাদের অঞ্চলের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি বা মানুষের কাছে হাজির হয়েছিলাম। তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী আবার কেউ কেউ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আমাদের প্রশ্নগুলো ছিল এই রূপ –

১) চন্দ্রযানের সফল অবতরণ সম্পর্কে মনোভাব কি?

২) মহাকাশ গবেষণার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোনও লাভ হয়?

৩) ল্যান্ডিং পয়েন্টের নাম শিবশক্তি রাখা সঠিক বলে মনে করেন?

৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল কি সব মানুষের কাছে পৌঁছয়?

৫) সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণার ফলে মানুষের মধ্যে টিঁকে থাকা বিভিন্ন কুসংস্কার নির্মূল হচ্ছে কি?

আমরা আমাদের ইউনিটের তিনটি এলাকায় অনুসন্ধান করেছি এ বিষয়ে। তার মধ্যে একটি হল কদমতলার নিকটবর্তী ভট্টাচার্য পাড়ার সংলগ্ন এলাকা, পাঁচ মসজিদ ও দরগাতলা মসজিদ এলাকা এবং পোড়া অশ্বত্থতলা এলাকায়।

প্রশ্নগুলির যে উত্তরগুলি আমরা পেয়েছি সেগুলি হল ঃ

১) প্রথম এলাকায় অধিকাংশই চন্দ্রযানের সাফল্যে খুশি। শুধু একজন ছাত্রী বলেছেন যে আগে দেশের মানুষের আশু প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন, কিন্তু এই গবেষণার বিরোধিতা করছে না সে।

দ্বিতীয় এলাকা (মসজিদ পাড়া এলাকা)-তে একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি বলেছেন সে তাঁদের ধর্মের জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই অভিযানে কেবলমাত্র ভারতীয়দের কৃতিত্বই নেই, সঙ্গে আছে ইহুদী ও সুন্নী মুসলমানদেরও (তিনি সম্ভবত মনে করেন ভারত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশ) একই প্রশ্নের জবাবে সবাই বলেছেন যে ঘঠনাটা শুনেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে সাতটা আসমান পার হয়ে কি করে যাবে চাঁদে। যেতেও পাড়ে? সেটা ওপর ওয়ালই জানে।

তৃতীয় এলাকার একটি রিক্সা স্ট্যান্ডে রিক্সাচালকরা বলেছেন যে এই ঘঠনাটি খুবই ভালো ব্যাপার।

২) মহাকাশ গবেষণার ফলে কি লাভ হয় সেই সম্পর্কে অনেকেই সম্পূর্ণ অবগত নন, কিন্তু অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা যায় বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপকার হতে পারে বলে মনে করেন। কেউ কেউ বলেছেন মহাকাশ গবেষণার ফলে আবহাওয়ার আগাম খবর জানার ফলে বিপদসংকুল অঞ্চলে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা হয়েছে। আমরা এই মতামত প্রথম এলাকা থেকে পেয়েছি।

দ্বিতীয় এলাকা মসজিদ পাড়ায় অধিকাংশই বলেছেন কোনো লাভ হয় না। তারা প্রায় সবাই বলেছেন যে আগে সমাজের ভিতটা (অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কাজ) শক্ত হওয়া দরকার। এরপর এসব করা উচিৎ। আমাদেরই টাকায় এসব

করছে সরকার। তাতে তার বিশ্বে নাম হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা তথৈবচ। শুধুমাত্র দুজন (মোট জনা ত্রিশেকের মধ্যে এই অভিযান থেকে মানুষের জ্ঞান লাভ হচ্ছে বলেছেন। কিন্তু তাঁরাও (বিশেষ করে শেষোক্ত ব্যক্তি) মনে করেন এর সঙ্গে বেঁচে থাকার আবশ্যিক বিষয়গুলোতেও নজর দেওয়া দরকার।

তৃতীয় এলাকার রিক্সাচালকরা ও এক ফলবিক্রেতা বলেছেন যে এই গবেষণায় এখুনি সুফল আমরা না পেলেও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা পাবে।

৩) যেহেতু ভারত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ তাই শিবশক্তি নাম রাখা ঠিক হয়নি। বরং বিজ্ঞানীর বা বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনও নাম রাখা উচিৎ ছিল। এই মত প্রথম দুটি এলাকায় পেয়েছি।

তৃতীয় এলাকায় রিক্সা স্ট্যান্ডের চালকরা বলেছেন যে এতে যাদের অসুবিধা, তাদের সমস্যা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। ঐ ফল বিক্রেতা মনে করেন এটা ঠিক হয় নি।

৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল দুই একটি ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা শ্রেণীর মানুষের কুক্ষিগত হয়ে থাকে। তৃতীয় এলাকায় এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে সহমত জানিয়েছে।

৫) প্রথম এলাকায় চন্দ্র, সূর্য নিয়ে যে অযৌক্তিক ধ্যানধারণাগুলো আছে সেগুলি সকলেই এক বাক্যে কুসংস্কার বলেছেন এবং তারা এগুলোকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস বলে মনে করেন। এর পিছনে কোনও যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে মনে করেন না।

দ্বিতীয় এলাকায় অধিকাংশ মানুষই মনে করেন তাঁদের ধর্মে (ইসলাম) এবং অন্য ধর্মে কোথাও নেই যে মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়াই সম্ভব। তাই তাঁদের কাছে এই প্রশ্নটা করা যায় নি। (কেবলমাত্র দুজন ছাড়া)। এঁদের প্রথম জন মনে করেন খালি চোখে চাঁদকে একরকম দেখায়, আর কাছে গেলে আরেক রকম। এটাই স্বাভাবিক। যেমন আমাদের মুখের থুতু কিংবা রক্ত খালি চোখে একরকম, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একেবারে আলাদা। এটা মানুষের জ্ঞানলাভের ফল। ঈশ্বর বিজ্ঞানীদের আশির্বাদ করেছেন এই জ্ঞানলাভের জন্য। দ্বিতীয় জন মনে করেন আধুনিক বিজ্ঞান কুসংস্কার বা পুরানো ধারণার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

তৃতীয় এলাকায় এবিষয়ে সকলেই সহমত পোষণ করেছেন।

যদিও উচ্চবিত্ত অংশের মানুষের, বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সমীক্ষা আমরা করে উঠতে পারি নি। তবে তিনটি এলাকার অনুসন্ধানের ছবিটি বৈচিত্রপূর্ণ।■

সমীক্ষা-২ ঃ

উত্তরবঙ্গে মদ কারখানা থেকে এলাকায় দূষণ প্রতিবাদে গ্রামীণ জনতা

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের পূর্বপ্রান্তে আছে ইস্টার্ন বাইপাস, এই বাইপাস রোডের দুইধারে যেমন শ্রমজীবী জনতার বসবাস তেমনই এখানে ২-৩ দশক ধরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কারখানা, গোডাউন ইত্যাদি। ঠাকুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় (ডাবগ্রাম-২ অঞ্চল, জেলা জলপাইগুড়ি) নিউ জলপাইগুড়ি-গৌহাটি গামী রেল লাইনের ধারে প্রায় দুই দশক আগে গড়ে উঠেছে কসমস বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি মদের কোম্পানি। হোর্ডিং বিহীন এই কারখানায় আনুমানিক তিন শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। এখানে নামী ব্রান্ডের মদ এবং অন্যান্য পণ্য উৎপাদন হয়। শ্রমিকদের মজুরি ২৫০-৩০০ টাকা (দৈনিক)। এখানে শ্রমিকদের কোন ইউনিয়ন নাই।

এই কারখানায় প্রচুর জলের প্রয়োজন হওয়ায় বিপুল পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা হয়। এর ফলে সংলগ্ন এলাকায় জলের স্তর ব্যাপক হারে নেমে যায় বলে স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। এছাড়া মদ তৈরির পর দূষিত বর্জ্য জল কোম্পানি এলাকায় ছড়িয়ে দেয় শোধন না করে। এর ফলে কারখানার সংলগ্ন অঞ্চলে এই জল থেকে ব্যাপক হারে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। কুয়ো, টিউব ওয়েলের জল বিষাক্ত হয়ে গেছে। নিচু এলাকাগুলিতে এই দুর্গন্ধযুক্ত জল জমা হয়ে থাকে। এই বিষাক্ত জল পান করে এলাকার বহু গরু-ছাগল ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর মৃত্যু হয়েছে, এই জল ব্যবহার করে অনেকের চর্মরোগ হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই অভিযোগ নিয়ে গ্রামবাসীরা

বার বার কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কোন সুরাহা তো পান নি, উল্টে তাদের ভয় দেখানো হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা আমাদের অভিযোগ করেন। এই দূষিত জল কারখানার পূর্বপ্রান্তে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বাহিত সাহু নদীর জলকেও বিষাক্ত করছে বলে অভিযোগ।

জুলাই ২০২৩-এর প্রথম সপ্তাহে কারখানার অভ্যন্তরের এই বিষাক্ত দুর্গন্ধযুক্ত জল থেকে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে। কোম্পানি মদ এবং অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের পর দূষিত জল পূর্বদিকের একটি বড় পুকুর কেটে জমা করে রাখত এবং ধীরে ধীরে তা এলাকায় ছড়িয়ে দিত। ওই পুকুরের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে একটি পাঁচিল। বিষাক্ত রাসায়নিকযুক্ত ওই জলের চাপে হঠাৎ পাঁচিল ভেঙে সমগ্র এলাকায় ওই জল ছড়িয়ে পড়ে। বহুকাল ধরে অভিযোগ জানিয়েও কোন সুরাহা না হওয়ার পর এই দুর্ঘটনা মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। দলমত নির্বিশেষে গ্রামীণ জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভে মহিলাদের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মত। বিক্ষোভের মুখে ম্যানেজার বলেন তার কিছুই জানা ছিল না। অতি সত্বর পাঁচিল পুনর্নির্মাণ করে পুকুরের পাড় বাঁধিয়ে, জল অন্যত্র ফেলার ব্যবস্থা করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

সমীক্ষায় জানা যায় যে টিন দিয়ে ভাঙা পাঁচিল বর্তমানে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য মাঝে মধ্যে গাড়ি করে জল অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কারখানার দক্ষিণ দিকের কোম্পানির জমিতে এখন মাঝে মধ্যে বিষাক্ত জল ফেলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পাইপ লাইন বসিয়ে ওই বিষাক্ত জল সাহু নদীতে ফেলার পরিকল্পনা হচ্ছে।

আমাদের কর্মীরা গ্রামবাসীদের জানান যে শিল্প-কারখানার দূষিত বর্জ্য জল Water Treatment Plant (জল শোধন প্লান্ট) বসিয়ে নিয়মিত শোধন করে পরিকল্পিত উপায় নিষ্কাশন করাই সমস্যা সমাধানের পথ। এর জন্য পরিবেশ দপ্তর আছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন আছে। এই কোম্পানি নিয়ম, নীতি, আইনের তোয়াক্কা না করে পরিবেশ দূষণ করছে। এখন এই জল শোধন না করে যদি সাহু নদীতে ফেলার পরিকল্পনা হয় তবে এই দূষণ বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়াবে।

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে প্রশাসন সব দেখেও না দেখার ভান করছে। অর্থের বিনিময়ে পুলিশ-প্রশাসন-নেতা-মন্ত্রীদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

মদের কারখানার পিছনের ভাঙা পাঁচিল ও পুকুর

গ্রামবাসীরা আমাদের কর্মীদের জানিয়েছেন, তারা বিষয়টা পরিস্কারভাবে বুঝেছেন। কোম্পানি সময় চেয়েছে। তারা বাস্তবে কি ব্যবস্থা নেয় তা দেখে ভবিষ্যতে জল পরিশোধন করে তবে তা নিষ্কাশনের জন্য পুনরায় আন্দোলনে নামবেন।

৫ই জুন ২০২৩, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের প্রচারিত প্রচারপত্রে আমরা বলেছিলাম "দেশের সমস্ত জল-জঙ্গল-জমি-খনিজ সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে ধনী ও অতিধনী মালিক এবং সরকারের। তবুও ন্যূনতম মজুরিতে (অধিকাংশ সময় আধা বা সিকি মজুরিতে) কর্মরত খেটে খাওয়া মানুষকে, গরীব কৃষিজীবী জনতাকে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী করা হয়। কলকারখানা-খনি, জমি বা জলে যে দূষণ ঘটে তার দায় মালিকশ্রেণী ও সরকারের। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে এইসব ক্রিয়াকলাপ। আজ পর্যন্ত দূষণের অভিযোগে কোন শিল্পপতিকে গ্রেপ্তার বা শাস্তিদানের খবর শুনেছেন কি?"

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ঠাকুরনগর অঞ্চলের মদ কারখানা থেকে ঘটা পরিবেশ দূষণ ও তার পরের চিত্র আমাদের প্রচারপত্রের বক্তব্যের বাস্তবতা প্রমাণ করছে। শ্রমজীবী জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনই যথার্থ পরিবেশ আন্দোলন হয়ে উঠতে পারে। ■

রিপোর্ট ঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতে অগ্রগতি

[বিগত সংখ্যায় ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩, জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রগতি'র শেষাংশ প্রকাশ করা হল।]

নবম বক্তা (ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রগতি) ঃ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে যেভাবে উৎপাদন বিকাশের সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে এদেশেও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা এক্ষেত্রে বড় বাধা হিসাবে কাজ করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর শাসনকালে বিজ্ঞান গবেষণায় তেমন কোন উৎসাহ দেওয়া হয় নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের গবেষণা বিদেশে ও দেশে চালিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পরবর্তীকালে ১৯২০-৩০-এর দশকে এক ঝাঁক ভারতীয় বিজ্ঞানী সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, সি. ভি. রমন, কিশোরী মোহন, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ – এঁরা হলেন বিজ্ঞান সাধনায় এক একজন দিকপাল। ব্রিটিশদের সহযোগিতা ছাড়াই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বসু বিজ্ঞান মন্দির, কালটিভেশন অফ সায়েন্সের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্যায়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ গড়ে ওঠে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে খড়্গপুর আইআইটি গড়ে ওঠে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ দেশে প্রথম স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার তৈরি করে। এই সময়কালেই ভারত সরকার প্রতিরক্ষা খাতে গবেষণার জন্য ডিআরডিও গড়ে তোলে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে সীমিত পরিসরে টেলিভিশন চালু হয় এবং ১৯৮২ থেকে সারা দেশে তার সম্প্রচার শুরু হয়। এটা সম্ভব হয় ভারত সরকারের সাথে নাসা-র যৌথ উদ্যোগে স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট (সাইট) গঠনের ফলে। সারা দেশের মানুষ আধুনিক জগৎ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী এম. এস. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে দেশের কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা দেহকোষের জেনেটিক কোডের গঠন এবং প্রোটিন সিন্থেসিস প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান। ভারত সরকারের আইপিসিএল-এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এই উদ্যোগে দেশে পেট্রোলিয়াম শিল্পের বিকাশ ঘটে। ১৯৭০-এ ভার্গিস কুরিয়ানের নেতৃত্বে দুগ্ধ উৎপাদনে প্লাবন আসে। এই বছরই মৎস চাষের জন্য ব্লু রেভোলিউশনের নক্সা তৈরি হয়। এটাই দেশে মৎস চাষের বিকাশের মুখ্য ভূমিকা নেয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে ভারতে প্রথম টেস্টটিউব বেবি-র জন্ম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম লোয়ার অরবিট অবজারভেশন স্যাটেলাইন ফর এক্সপেরিমেন্টাল রিমোর্ট সেসিং 'ভাস্কর-১' লঞ্চ করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ মেরু আন্টার্কটিকায় ভারতের প্রথম সায়েন্টিফিক বেস স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩-তেই বিজ্ঞানী সুব্রমনিয়ম চন্দ্রশেখর তারাদের গঠন এবং বিবর্তন নিয়ে গবেষণায় পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা সোয়েজটি-১১ চড়ে প্রথম মহাকাশে পাড়ি দেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে দেশে প্রথম সুপার কম্পিউটার 'পরম ৮০০০' এর জন্ম হয়। ১৯৯১-এ বিজ্ঞানী লালজী সিং ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং পদ্ধতি এদেশে চালু করেন। ১৯৯৫-এ ভারতে প্রথম মোবাইল ফোন চালু হয়। ২০০১-এ দেশীয় প্রযুক্তিতে লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট 'ভেজস' আকাশে ওড়ে। ২০০৮-এ ইসরো দেশে প্রথম 'লুনার প্রোব' চন্দ্রযান উৎক্ষেপণ করে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে রাইবোজোমের গঠন ও কার্যকারিতার বিষয় গবেষণায় রসায়নে ভেঙ্কটরমন রামাকৃষ্ণান নোবেল পুরস্কার পান। ২০১৩-তে ভারত থেকে প্রথম 'মার্স অরবিট মিশন' মঙ্গলযান উৎপক্ষেপণ করা হয়। ২০১৪-এ WHO ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করে। ২০১৫-এ ভারত প্রথম উত্তর মেরু পর্যবেক্ষণ স্টেশন তৈরি করে নরওয়ে এবং উত্তর মেরুর মাঝামাঝি। ২০১৯-এ ইসরোর দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান সফল হয়। এই হল ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার প্রগতির সংক্ষিপ্ত চিত্র।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ভারতে শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের আধিপত্য শুরু হয়। প্রাক মাধ্যমিক স্তর থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষা এখন বাধ্যতামূলক। নভেম্বর ২০২২-এর সরকারি হিসাবে দেশে মোট ১০৭০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যার অধিকাংশতে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ১৫০০টি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আছে ২১৬টি নামী প্রতিষ্ঠান। ভারতে প্রতিবছর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ৪৭-৪৮ হাজার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারগুলি, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবছর বিনিয়োগ করে। ভারতে বর্তমানে গড়ে প্রতিবছর ৬ হাজার গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ভারত সরকার বিজ্ঞান গবেষণাকে উৎসাহদানের জন্য বিজ্ঞানীদের নানা পুরস্কারে ভূষিত করেন। এই হল ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষার অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র।

দশম বক্তা (ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রগতি) ঃ আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য আগের বক্তাকে খন্ডন করা নয়। বর্তমান বিশ্বে সকলেই ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতির কথা মেনে নেবেন। আজ আমরা সাধারণ মানুষ যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছি তা সকলই বিশ্বের অসংখ্য বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অবদান। বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দায় নানা ভাবে অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলা করে, সকল বাধা অতিক্রম করে বিজ্ঞান এগিয়ে যাবেই। কিন্তু আমার বন্ধু এই বাধার দিকটি উপেক্ষা করায় বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ হিসেবে, বিজ্ঞান আন্দোলনের সচেতন কর্মী হিসেবে আমাদের করণীয় কিছু উঠে এল না। উঠে এল না, বিশ্বজুড়ে নানা দেশের শাসকশ্রেণী এবং বিশেষ করে ভারতীয় শাসকদের বিজ্ঞান বিরোধী কার্যকলাপের। আলোচনায় এখনও নয়জন বক্তার বক্তব্যে আসেনি একটি প্রশ্নের জবাব। তা হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এতো উন্নতি সত্ত্বেও দেশের ব্যাপক জনতার পুঁতিগন্ধময় পরিস্থিতিতে, অসহায় হয়ে অশিক্ষা আর স্বাস্থ্যের ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কেন অন্ধকারে পড়ে রয়েছেন? অল্প সময়ে আমি বিষয়টি রাখার চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ বিজ্ঞানের বিকাশ যদি বর্তমানের শতগুণও বিকশিত হয়। সকল মারণ রোগের চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়, মানুষ চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহে বসবাস করার ব্যবস্থাও করে ফেলে, তবুও কি শ্রমজীবী জনগণ মানুষের মত বাঁচতে পারবে? সকল কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে? না। তা হবে না। কারণ বর্তমান বিশ্ব বাজার অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত। এখানে সমস্ত সম্পদের কার্যত মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর সকল ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য মুনাফা, আরও মুনাফা। সাধারণ মানুষের জীবনে প্রগতি তাদের লক্ষ্য নয়। তাই তো আমরা দেখি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রধান শিকার বিশ্বের মেহনতী জনতা। প্রযুক্তির যত উন্নতি হয় তা শ্রমজীবীদের শ্রমলাঘব না করে তাঁদের এই সমাজে ব্রাত্য করে তোলে। তা বলে কি আমরা বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের বিরোধিতা করব? না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই বেকারত্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়। দায়ী মুনাফাখোড়ী সমাজ ব্যবস্থা। সমগ্র মানব সমাজের বিকাশের স্বার্থের সমাজ ব্যবস্থাই এই বৈপরীত্বের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মানব সমাজের বিকাশকে শতগুণ এগিয়ে দেবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সকল বাধা অপসারিত হবে।

এবার আমি ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যে বাধা ও সমস্যাগুলি আছে তা তুলে ধরছি। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে দেশের ৬০.৬ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর। এই জনতার ২৫.২ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। অষ্টমশ্রেণী অবধি শিক্ষায় শিক্ষিত দেশের শিক্ষিত জনতার ১৫.৭ শতাংশ জনতা, মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেশের শিক্ষিতদের ১১.১ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিক বা তার উপরের স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন ৮.৬ শতাংশ। সারা দেশে মোট ৪.৫ শতাংশ মানুষ গ্র্যাজুয়েট বা তার উর্ধ্বে শিক্ষিত এবং দেশের মাত্র ০.৮১ শতাংশ মানুষ স্নাতোকত্তোর ডিগ্রির পর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই চিত্র কি সত্যিই গৌরবের?

পরের প্রশ্ন হল এই গবেষণার জন্য গবেষকদের ভাতা এবং পরিকাঠামোগত খরচ হিসাবে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়? ২১/৬/২০২২-এ ইকনমিক টাইমসে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে দেশের মোট জিডিপি'র মাত্র ০.৭ শতাংশ। যা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে একেবারে সর্বনিম্ন হারের কাছাকাছি। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের তথ্য অনুসারে সমগ্র বিশ্বে গড়ে ২৮ হাজার বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে মোট ১৮ লক্ষের অধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতে হয় ৪৭ হাজার ৮৫৭। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলের মতামত অনুসারে এই জার্নালগুলির ৯০ শতাংশই আন্তর্জাতিক মানে ভীষণ নীচু। এই কারণে দেশের উন্নত মানের গবেষণা সংস্থা এবং গাইডরা দেশের কোন জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। বলুন এই চিত্র কতটা গৌরবের?

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ৪৫.৪% কেন্দ্র, ৬.৪ শতাংশ রাজ্য সরকারগুলি, ৬.৮ শতাংশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি, ৪.৬ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি এবং ৩৬.৮ শতাংশ বিনিয়োগ করে প্রাইভেট সংস্থাগুলি। এদেশে ২৬টি বহুজাতিক কোম্পানি গবেষণায় বিনিয়োগ করে যেমন টাটা এলক্সি, টাটা এনার্জি, সিপলা, লুপিন, হিন্দুস্থান এরোনটিক্স, সান ফার্মা, হুন্ডাই মোটর প্রভৃতি। সরকার ও গবেষণা সংস্থাগুলি গবেষকদের ভাতা, গাইডদের বেতন এবং পরিকাঠামোর জন্য অর্থ ব্যয় করে আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পণ্য ও প্রযুক্তির বিকাশের জন্য অর্থ ব্যয় করে। এই কারণে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োজিত হয় নামমাত্র, কারণ পুঁজিবাদী বিশ্বে মৌলিক গবেষণালব্ধ ফল থেকে আশু মুনাফা হয় না। এই চিত্র বিশ্বের সর্বত্র বিরাজ করছে। বর্তমানে তাই আমরা দেখছি যে গবেষণায় প্রধানত অর্থ বিনিয়োজিত হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট প্রযুক্তি, তথ্য গবেষণা, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ড্রাইভারহীন গাড়ি নির্মাণ, বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণ, সেমিকন্ডাক্টর, ঔষধ শিল্প, হাইস্পিড ব্রডব্যান্ড প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

এই পরিস্থিতিতে গবেষকরা বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি। স্কলারশিপ সময়মত না পাওয়া, ল্যাবরেটরির উন্নতিতে বাধা, বহুক্ষেত্রে গাইডের সহযোগিতা, বিদেশযাত্রায় ছাড়পত্র পেতে প্রশাসনিক বাধা, জার্নাল প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি। পিএইচডি-র পর কি করব এই অনিশ্চয়তা তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। দেশ-বিদেশের গবেষকদের মধ্যে তাই মনোরোগের সমস্যা বাড়ছে। অনেকেই মাঝপথে গবেষণা ত্যাগ করে গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য পথ বেছে নিচ্ছেন।

সরকার অতীতে বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দিতে নানা পুরস্কার

দিত। বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকটের অজুহাত দিয়ে ভারত সরকার এইসব পুরস্কারের অধিকাংশই বন্ধ করে দিয়েছে।

এদেশের সরকার কোনদিনই বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা সমাজের অধিকাংশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনন তৈরিতে আগ্রহী ছিল না। এখন তো আবার সরকারি মদতে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞানের প্রসার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা হচ্ছে গোবর ও গোমূত্র সর্বরোগহারা এটা প্রচার করতে, নবনির্মিত রামমন্দিরে রামলাল'র মাথায় প্রথম সূর্যকিরণ ফেলার ব্যবস্থা করতে। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বানরসেনাদের নিয়ে সমুদ্রে রামসেতু তৈরি করেছিল এটা প্রমাণ করানোর জন্য ছদ্মবিজ্ঞানের গবেষণা চলছে। জ্যোতিষশাস্ত্রকে জ্যোর্তিবিজ্ঞান বলে চালানোর প্রয়াস চলছে। বর্তমান শিক্ষাকাঠামোর উদ্দেশ্য বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তোলা নয়, মুখস্ত করে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া। সুতরাং বিগত ৭৫ বছরে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে এটা ১০০ শতাংশ সত্যি বলা যায় না। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি এই মুনাফাখোড়ী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়।

সঞ্চালক – সমগ্র আলোচনা সমাপ্ত হল। আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং জনমানসে তার প্রতিফলন জেনে সত্যে উপনীত হওয়া। মোট ১০ জন আলোচক অল্প সময়ে যথাযথভাবে তা তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন। আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে ভারতে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নাগরিক পরিসেবা, বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় পূর্বের তুলনায় অবশ্যই উন্নতি হয়েছে। সমাজ সভ্যতার বিকাশের মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই অগ্রগতি স্বাভাবিকভাবেই শ্রমজীবী জনতার জীবনে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটায় নি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিশেষতঃ বাজার অর্থনীতি আধারিত সমাজে মুনাফাই যেহেতু প্রথম এবং শেষ কথা তাই এখানে সবকিছুই হয় মুনাফার তাগিদে, মানব সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে নয়। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবসান এবং মানুষের জন্য, মানুষের স্বার্থে পরিচালিত সমাজেই বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য – 'প্রকৃতির নিয়ম জেনে সমাজ কল্যাণে তার রূপায়ণ' একমাত্র সম্ভব। সকল আলোচক এবং ধৈর্য্যশীল দর্শকদের অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি।■

রিপোর্ট ঃ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে শিশুদের ভাবনা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে নানা অনুষ্ঠান হয়। সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে স্কুল-কলেজ-অফিস-ক্লাব সর্বত্র 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও' অভিযান চলে। বৃক্ষ রোপণ করে সেলফি তুলে পোস্ট করার নির্দেশিকা থাকে। ঝাড়ু হাতে কোথাও কোথাও ময়লা পরিস্কার, কোথাও বা প্লাসটিক ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান রাখা হয়। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের বেহালা-ঠাকুরপুকুর শাখা (কলকাতা) এবছর ওইদিন বড়িষা অঞ্চলের একটি কোচিং ক্লাসে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে প্রবন্ধ লেখার আহ্বান করা হয়। কোচিং এর শিক্ষিকা (আমাদের সদস্য) তার ছাত্রছাত্রীদের বলেন 'নিজের মন থেকে যা দেখছ তাই লিখবে এবং সত্য কথা লিখবে'। এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠাণে অংশ নেয়। বেশ কয়েকজন লেখে পরিবেশ দিবসে পরিবেশকে নির্মল রাখার আহ্বান করা হচ্ছে অথচ সাফাই কর্মীর মত শ্রমজীবীরা বা বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত মানুষ যে খারাপ পরিবেশে বসবাস করেন বা কাজ করেন তাদের কাজের পরিবেশ, বসবাসের পরিবেশ উন্নত না হলে পরিবেশ নির্মল হতে পারে না। অনেক ছাত্রছাত্রীরা লেখে পরিবেশ বলতে শুধু পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠঘাট বোঝায় না। মানুষ এবং তার চারপাশের জৈব এবং অজৈব জগৎ হল পরিবেশ। তাই মানুষের থাকার, কাজ করার, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের পরিবেশ ঠিক না হলে পরিবেশ উন্নত হয় না। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আবার নিজেদের বাবা-মায়েরা কোন খারাপ পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হয় তার উল্লেখ করে বিষয়টিকে জীবন্ত করে তুলেছে। অনেকে আবার পরিবেশ সুন্দর করতে সমাজের পরিচালকদের পাশাপাশি প্রতিটি ব্যক্তিকে পরিবেশ সচেতন হওয়ার বিষয়, আমাদের মধ্যে থাকা অনেক কুঅভ্যাস ত্যাগ করার বিষয় তুলে ধরেছে। মোট ১৯ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রবন্ধ লেখার আসরে যোগ দিয়ে শিশু বয়সেই সচেতন নাগরিকের ভূমিকা পালন করেছে যা বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। এই কোচিং ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মত ঘরে ঘরে যদি আমরা পরিবেশ সচেতন, বিজ্ঞান সচেতন, সমাজ সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে পারি তবেই আগামী দিনে সুস্থ পরিবেশ, সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন বিকশিত হযে উঠবে। তাই শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে নয়, সমাজের শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সমাজ সচেতন-পরিবেশ সচেতন-বিজ্ঞান সচেতন করে তোলার শিক্ষা আমরা পেলাম কোচিং ক্লাসের এইসব ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। স্থানাভাবে রচনাগুলি প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আগামী সংখ্যায় এই শিক্ষণীয় রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত অংশ আমরা প্রকাশ করব।■

সমাজ দর্পণ ঃ

একটি শিশু মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন

গত অগাস্ট মাসের ৪ তারিখে ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে একটি শিশু ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কলকাতার বেহালা চৌরাস্তার মোড় একেবারে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সমস্ত মিডিয়ার প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই চৌরাস্তার মোড়। লাঠি বন্দুক হাতে পুলিশ-এসটিএফ এর ছোটা-ছুটি, কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এই চত্তর। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের সাক্ষী হয়ে থাকে পোড়া ট্রাফিক-কন্ট্রোলের অফিস, পোড়া জিপ, পোড়া বাইক।

বেহালা চৌরাস্তার মোড় একটি অত্যন্ত জনবহুল মোড়। দু'দিক দিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোড ও বীরেন রায় রোডের সংযোগস্থল এটি। ঠিক এই সংযোগস্থলেই ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর ১৬৭ বছরের পুরোনো বড়িষা হাই স্কুল। সকালে শুধু প্রাথমিক স্কুলেই পড়ে ১০০০ জন শিশু ছাত্র-ছাত্রী। মোড়ের একদম কাছেই রয়েছে ট্রাফিক পুলিশের ফাঁড়ি।

গত ৪ঠা অগাস্ট, বড়িষা স্কুলের প্রাথমিক স্কুল খোলা হয় যথা সময়ে। ক্ষুদে ক্ষুদে পড়ুয়ারা তাদের বাবা বা মায়ের হাত ধরে স্কুলে পৌঁছাচ্ছে। ঐ দিন আবার পরীক্ষা ছিল। ছোট্ট সৌরনীলও তার বাবার হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছিল। কিন্তু মাঝ রাস্তাতেই সিগনাল খুলে যায়, মুহূর্তের মধ্যে ধেয়ে আসলো এক লরি, চাপা দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে দেয় ছোট্ট শরীরটি এবং বাবার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। উপস্থিত সকলে দৌঁড়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে শেষ হয়ে যায় সৌরনীল। জনতা থামাতে চেষ্টা করে লরিটি। কিন্তু পুলিশের কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। লরিটি খুব সহজেই বেরিয়ে যায়। খবর পেয়ে প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবকরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। পুলিশ ভিড় সামলাতে লাঠি তোলে কিন্তু সৌরনীল ও তার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কোন উদ্যোগ দেখায় না। শিক্ষক ও অভিভাবকরা নিজস্ব উদ্যোগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রক্তাক্ত নিথর শিশুটি তখনও পড়ে থাকে। লরিটি করপোরেশনের লরি ছিলো। ক্ষুব্ধ জনতা প্রশ্ন করে কেন বেহালা বা মাঝের হাটে লরিটি ধরা পড়লো না? কেন পুলিশ শিশুটি ও তার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তৎপর হলো না? পুলিশ এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা না করে লাঠি চার্য করে বসলো। উপস্থিত জনগণের একটা বড় অংশ ছিলো মহিলা। কোন মহিলা পুলিশ নেই অথচ নির্মমভাবে লাঠি চলল। ততক্ষণে এসটিএফ-ও এসে গেছে। পুলিশের এই অমানবিক আচরণে জনতাও ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের ফাঁড়ি, পুলিশের জীপে, বাইকে আগুন ধরিয়ে দিল। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে শুরু করলো, এমনকি স্কুলের ভিতরেও তা ফেলা হলো। এতে স্কুলের ছোট ছোট শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওদিকে দীর্ঘ চার ঘন্টা ধরে শিশুটির মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে ছিল। এরপর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। প্রতিবাদে সরব প্রচুর মানুষকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করেছে। কাঁদানে গ্যাস স্কুলের ভিতরে ছোড়ার ব্যাপারে সাফাই গেয়েছে যে দুষ্কৃতিরা নাকি স্কুলের ভিতরে ছিল, তাই তারা ঐ কাজ করেছে। কাছাকাছি বেসরকারী স্কুলগুলোতে গিয়ে পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসাররা ছোট ছোট শিশুদের বুঝিয়েছে যে সব দোষ সৌরনীলের বাবার ও জনগণের। তবে এত কিছুর পরে পুলিশ মোতায়েন হয়েছে স্কুলটিতে। পরের দিন অর্থাৎ শনিবার 'বিজ্ঞান মনস্ক'র বেহালা ইউনিট থেকে চারটি বয়ান নিয়ে আমরা পোস্টারিং করেছিলাম বেহালা-ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে। স্কুলের সামনে গিয়ে দেখি থিক থিক করছে পুলিশ। একটু চিন্তা হচ্ছিল যে – পুলিশ আমাদের পোস্টারিং করতে দেবে কিনা! আমাদের সব সংশয় দূর করে সামনে দাঁড়িয়ে গেল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণীরা –'মা'য়েরা। পুলিশ শুধু একটু উঁকি-ঝুঁকি মেরে ছবি তুলে নিয়ে গেল।

এই তো গেল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ঘটনার দিন বেশ কিছু জনতা অভিযোগ করেন যে – পুলিশ টাকার বিনিময়ে ঐ ঘাতক লরিটিকে ছেড়ে দেয় সেই মুহূর্তে। যদিও পরে হাওড়ায় লরিটি ধরা পড়ে। লরিটি বেহালা থেকে হাওড়া অবধি গেল কি করে বিনা বাধায়? বড়িষা স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের হেড-মাষ্টার অর্জুন রায়ের হাউ-হাউ করে কান্না সকলের চোখের পাতা ভিজিয়ে দিয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন – বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও স্কুল খোলা বা বন্ধের সময় পুলিশ মোতায়েন করা হয় নি এতদিন। অথচ অদূরে থাকা বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকে। তাহলে সরকারী স্কুলে পড়া গরীব শিশুদের কি প্রাণের কোন মূল্য নেই?

ছোট সৌরনীলের অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। সৌরনীলের মৃত্যু রেখে গেল কিছু প্রশ্ন – গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে স্কুলের ছুটি ও শুরুর সময় পুলিশ মোতায়েন ছিল না কেন?

শত শত বাচ্চা স্কুলের ভিতরে আছে জেনেও পুলিশ কাঁদানে গ্যাস স্কুলের ভিতরে ছুড়লো কেন? ■

বিজ্ঞানের খবর

মে, ২০২৩

১. ●মানুষের মস্তিষ্ক কি ভাবছে তা কম্প্যুটারের পর্দায় ভেসে উঠছে এমন দৃশ্য কোন কল্পবিজ্ঞানে অনায়াসে স্থান পেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে? টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এমন একটি মডেল উদ্ভাবন করেছেন যা ব্যবহার করে মানুষের চিন্তাকে রীতিমতো লিখিত অক্ষরে ভেসে উঠছে কম্প্যুটারের পর্দায়। যদিও, বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই ডিকোডিং একেবারে হুবহু নয়। ফাংশানাল ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং বা এফএমআরআই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে কোন রকম অস্ত্রোপচার ছাড়াই এটা সম্ভব হয়েছে। (ন্যাচারাল নিউরোসায়েন্স) ●মরণাপন্ন মানুষের মস্তিষ্কের ইইজি (ইলেক্ট্রো এনসেফালোগ্রাম) থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরীক্ষা করে মরণাপন্ন ও কোমাচ্ছন্ন অবস্থায় মস্তিষ্কের গতিবিধি সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা পেয়েছেন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। (দ্য গার্ডিয়ান)

৩. ●'এলি লিলি' নামক একটি মার্কিন ড্রাগ কোম্পানী দ্বারা প্রস্তুত একটি ড্রাগ 'ডোনানেম্যাব' অ্যালজাইমার রোগ ছড়িয়ে পড়ার গতিকে প্রায় ৩৫% হ্রাস করতে পারে বলে দাবি করেছে। মানব শরীরে এই ড্রাগ প্রয়োগ করা হয়েছে ও আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। (সিএনবিসি)●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জেমিনি সাউথ দূরবীণ-এর সাহায্যে একটি নক্ষত্র দ্বারা একটি বহির্গ্রহকে 'গিলে খাবার' ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই অপূর্ব মহাজাগতিক ঘটনাটি দেখাচ্ছে কিভাবে একটি গ্রহের মৃত্যু হয়। উল্লিখিত বহির্গ্রহটির আকৃতির বৃহস্পতি গ্রহের সমতুল্য ও নক্ষত্রটি সূর্য্যের সমতুল্য। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন আমাদের সৌরমন্ডলেও একই ঘটনা ঘটবে। সূর্য্য যখন লোহিত দানব-এ পরিণত হবে তখন সে ধীরে ধীরে বুধ, শুক্র ও পৃথিবীকে গিলে খাবে। তবে তা ৫০ লক্ষ বছর পরে। (সিবিএস নিউজ)

৫. ●বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাল এখন থেকে কোভিড-১৯ বিশ্ব স্বাস্থ্য জরুরী অবস্থায় নয়। কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী প্রায় ৭৬৫ মিলিয়ন মানুষকে সংক্রামিত করেছে ও প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবী সেই সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে। (সিএনএন)

৮. ●হাভার্ড মেডিক্যাল স্কুল ও কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের সম্ভাবনা নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। কেবলমাত্র রোগীর মেডিক্যাল রিপোর্টের উপর নির্ভর করে বহু আগেই এই রোগ নির্ণয় সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। এর ফলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করে রোগীর প্রাণ বাঁচানো আরও সহজ হবে। (নেচার মেডিসিন)

১০. ●আণুবীক্ষণিক এককোষী প্রাণী বহুকোষী প্রাণীতে কিভাবে বিবর্তিত হল তা পরীক্ষাগারে প্রত্যক্ষ করলেন বিজ্ঞানীরা। এককোষী ঈষ্টকে বিশেষ মাধ্যমে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন কোষ বিভাজনের পর কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে না গিয়ে বহুকোষী আকার নিচ্ছে। দুইমাস পর প্রায় একশটি কোষের বহুকোষীয় আকার লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানীরা। ৬০০ দিন পর যা কয়েক মিলিটিমারের একটি দৃশ্যমান তুষারকণার আকার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে এককোষী প্রাণী কিভাবে বহুকোষী প্রাণীতে বিবর্তিত হয় সেই রহস্যের সমাধান হয়তো অচিরেই বিজ্ঞানীদের নাগালে চলে আসবে। (দ্য আটলান্টিক)

১১. ●বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শনিগ্রহের আরও ৬২টি নতুন চাঁদ-এর সন্ধান পেয়েছেন। এই নিয়ে শনির মোট চাঁদের সংখ্যা হল ১৪৫। অন্যদিকে বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদের সংখ্যা ৯৫। (ইউ বি এস নিউজ)

১৭. ●বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এতদিন মানুষের বিবর্তনের যে সরল পথ জানা ছিল তা আসলে অতটা সরল নয়। এতদিন বিজ্ঞানীরা মনে করতেন হোমোসেপিয়েন্স-এর উদ্ভব আফ্রিকার একটি বিশেষ অঞ্চলে একটি বিশেষ সময়ে হয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবাশ্ম ও জিনোম পরীক্ষা করে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। (নেচার)

১৮. ●সম্প্রতি মহাকাশচারীরা ২০০০টি গ্রহাণুকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি আগামী এক হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষে চলে আসবে। এর মধ্যে ২৮টির ব্যাস এক কিলোমিচার বা তার অধিক। মার্কিন মহাকাশ গবেষনা কেন্দ্র নাসা'র জেট প্রোপালশান ল্যাবোরেটরির মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই গ্রহাণুগুলির সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা তৈরী

হবে। এর মোকাবিলা করা তাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। (ইন্ডিপেন্ডেন্ট)

২৫. ●প্রশান্ত মহাসাগরের ক্লিপার্টন ফ্র্যাকচার জোনে প্রায় ৫০০ নতুন সামুদ্রিক প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ঐ অঞ্চলের আয়তন ভারতের আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ যা বহু খনিজ পদার্থে ভরপুর। ভবিষ্যতে গভীর সমুদ্রে খননকার্যের জন্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কোম্পানীকে বরাত দেওয়া হয়েছে। (দ্য গার্ডিয়ান)●আমাদের সৌরমন্ডলকে ঘিরে রয়েছে গ্রহাণুর উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট একটি অঞ্চল, যার নাম 'কুইপার বেল্ট'। নাসা'র মহাকাশযান নিউ হরাইজন ইতিমধ্যে সে অঞ্চল অতিক্রম করেছে। সম্প্রতি নাসা-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে তারা সম্ভবত দ্বিতীয় কুইপার বেল্ট-এর সন্ধান পেয়েছেন। এই দশকের শেষের দিকে নিউ হরাইজন ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করবে ও এই ব্যাপারে নতুন তথ্য সরবরাহ করবে। (স্পেসরেফ)

২৯. ●১৯.৩% কর্মক্ষমতা সম্পন্ন জৈব সৌরকোষ বানাতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। (হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি)

জুন

১. ●পৃথিবীর বুকে যে সৌর শক্তি আছড়ে পড়ছে তাকে ধরে রাখার প্রযুক্তি মানুষের অজানা নয়। এবার মহাকাশযান-এ স্থাপিত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তা থেকে সংগৃহীত সৌর শক্তিকে তারবিহীনভাবে পৃথিবীতে পাঠানো সফল করলেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যালটেক নামক একটি বেসরকারী গবেষণা সংস্থা তাদের পাঠানো মহাকাশযান থেকে এই পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। মহাকাশে ধূলোবালি না থাকায় উচ্চ পরিমাণে সৌর শক্তি গ্রহণ ও প্রেরণ এই প্রযুক্তিতে হয়েছে। যা কাজে লাগিয়ে আগামীদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সোলার পাওয়ার ষ্টেশন সম্ভব হবে, এমন কি চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহেও এই প্রযুক্তি কাজে লাগানো যেতে পারে বলে ঐ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। (দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট)

৫. ●২০১৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার গুহা থেকে আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন মানুষের জীবাশ্ম। প্রায় ৫ লক্ষ বছর পূর্বে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রজাতিদের নামকরণ করা হয় 'হোমো নালেডি'। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ঐ গুহাগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ঐ মানুষেরা আগুন জ্বালাতে সক্ষম ছিল, গুহার পাথরে বিভিন্ন শিল্পকর্মে ছিল পারদর্শী, এমনকি মৃত্যুর পর কবর দেওয়ার প্রথাও চালু চিল। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)●আর্মষ্টাডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জীববিজ্ঞানী টবি কিয়ারস সম্প্রতি মাইকোরাইজাল ছত্রাকের উপর গবেষণা করে জানতে পেরেছেন যে ঐ ছত্রাক প্রকৃতির কার্বনের বিশাল এক ভান্ডার। বিশ্বব্যাপী পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানী দহনজনিত মোট কার্বন নিঃসরণের প্রায় ৩৬ শতাংশ এই ছত্রাক দ্বারা শোষিত হয় যা চীন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট কার্বন নিঃসরণের সমান। এই ছত্রাক বায়ুমন্ডলের কার্বন বৃদ্ধি প্রতিহত করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে ঐ বিজ্ঞানী মনে করেন। (ওয়াশিংটন পোষ্ট)

৬. ●একটি গবেষণায় জানা যাচ্ছে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সুমেরু মহাসাগর বরফ শূন্য হয়ে যাবে। পূর্বে যা ধারণা করা হয়েছিল তার অনেক আগেই এই ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। (নেচার)

৮. ●মাছ ও মাংসের মধ্যে 'টরিন' নামক একটি যৌগ থাকে, মানব শরীরে যার মাত্রা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কমতে থাকে। নিউ ইয়র্ক-এর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক লক্ষ্য করেছেন। বানর সমেত বিভিন্ন জীব দেহে এই যৌগ প্রয়োগ করে দেখা গেছে তাদের স্মৃতিশক্তি, জীবনীশক্তি, হাড়ের ঘনত্ব ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটছে, এমনকি আয়ু প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে মানুষের ক্ষেত্রেই তা এখনও প্রয়োগ করা হয়নি বা শরীরে কিভাবে তা কাজ করে তা জানা যায়নি। (বিবিসি নিউজ)

১৪. ●আমাদের নীল গ্রহ পৃথিবী তৈরী হতে কত সময় লেগেছে? পূর্বের ধারণা অনুযায়ী প্রায় ১০ কোটি বছর। ইদানীং বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন মাত্র ৩০ লক্ষ বছরেই তৈরী হয়ে গেছে আমাদের পৃথিবী। (ওয়াশিংটন পোষ্ট)●মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তারা শনিগ্রহের চাঁদ এনসেলাদুস-এ ফসফেটের সন্ধান পেয়েছেন। প্রাণের গঠনের জন্য ঐ চাঁদে প্রয়োজনীয় সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করল বিজ্ঞানীরা। ক্যাসিনি নামক মহাকাশযান থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২১. ●মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের কিডনীকে ১০০ দিন সংরক্ষিত করার পর তা অন্য ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছেন। স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোন অঙ্গকে এত দীর্ঘ সময় ব্যাপী সংরক্ষণ করা (ক্র্যাওপ্রিজার্ভ) ও সফলভাবে তা প্রতিস্থাপিত করার ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। ন্যানোওয়ার্মিং পদ্ধতিতে কিডনির কর্মক্ষমতা সুরক্ষিত থাকছে বলে বিজ্ঞানীরা

জানিয়েছেন। (নেচার কম্যুনিকেশন)

২৬. ●আন্তঃনাক্ষত্রিক বা সৌরজগত-বহির্ভূত স্থানে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মিথেনিয়াম আয়নের সন্ধান পেয়েছেন। এই পরাতড়িতাধানযুক্ত কার্বন প্রাণের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। (নেচার) **●মহাকাশের ছায়াপথ থেকে নিঃসৃত মহাজাগতিক রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে পৌঁছয় না। ঐ রশ্মি মহাকাশের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বিচ্যুতি ঘটে ও বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে নিউট্রিনো কণায় রূপান্তরিত হয়। এই প্রথম বিজ্ঞানীরা একটি প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন যা ছায়াপথ থেকে নিউট্রিনো কণার নিঃসরণ সনাক্ত করা যায়।** (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

জুলাই

১. ●ফ্লরিডা থেকে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইএসএ) প্রেরণ করল একটি মহাকাশযান যা বহন করছে 'ইউক্লিড' নামক একটি দূরবীণ। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র সাথে যুগ্মভাবে ছয় বছর মেয়াদী এক গবেষণার অঙ্গ হিসাবে দূরবীণটি ডার্ক এনার্জি এবং ডার্ক ম্যাটার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে ও মহাকাশের ত্রিমাত্রিক ছবি সংগ্রহ করবে। (বিবিসি নিউজ)

৫. ●হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ইসরায়েল মহাকাশ বিজ্ঞানী আভি লোয়েব দাবি করেছেন যে তিনি আন্তঃনক্ষত্রীয় বস্তুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। যে বস্তুটি কোন নক্ষত্রের অভিকর্ষের আওতাভুক্ত নয়। তিনি গ্যালিলেও প্রোজেক্টের-এ গুরুত্বকে উর্দ্ধে তুলে ধরেন। গ্যালিলেও প্রোজেক্ট হল মহাকাশে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন জীবের অস্তিত্ব যাচাই করার লক্ষ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা। (নিউজ উইক)

৬. ●বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে মেরু অঞ্চলের হিমবাহগুলি অতি দ্রুত গলনের সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে বরফের নীচে আবদ্ধ থাকা মিথেনের বিশাল ভান্ডার উন্মুক্ত হচ্ছে ও প্রাকৃতিক প্রস্রবণ সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যা অনুমান করা হচ্ছিল তার দ্বিগুণ গতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। (নেচার জিওসায়েন্স)

১০. ●রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের লেজার এনার্জেটিক্স পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ডায়নামিক শেল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। আগামীদিনে ফিউশন বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বৃহৎ আকারে তড়িৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই পদ্ধতি খুবই নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব এবং সস্তা।(রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়)

১২. ●এই মহাবিশ্বের জন্ম রহস্য, তার বেড়ে ওঠার ইতিহাস, মহাকাশে ঘটে চলা বিস্ময়কর ঘটনাবলীর রহস্য উদ্ঘাটন ইত্যাদি বহু জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে মহাকাশে নিক্ষেপ করা হয়েছিল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। যার বয়স সম্প্রতি এক বছর পূর্ণ হল। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে প্রত্যাশা নিয়ে টেলিস্কোপটিকে পাঠানো হয়েছিল সে তা অতিক্রম করেছে ও প্রতিদিন মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৪. ●ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো সফলভাবে চন্দ্রায়ন-৩ উৎক্ষেপ করল। পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ দেশ হিসাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে মৃদু অবতরণের উদ্দেশ্যে চন্দ্রযান প্রেরণ করল ভারত। (ইসরো)

১৮. ●দক্ষিণ আফ্রিকার এক স্বর্ণ খনিতে প্রকৃতিজাত 'গ্রাফিন'-এর সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। গ্রাফিন হল কেবলমাত্র কার্বন পরমাণু দ্বারা নির্মিত একস্তরীয় পদার্থ যার পুরুত্ব একটি কার্বন পরমাণুর সমতুল্য। তড়িৎ ও তাপের সুপরিবাহী গ্রাফিন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সিলিকন ট্রানজিসটারের বদলে আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। তাপ ও তড়িতের কুপরিবাহী প্লাস্টিকের সাথে গ্রাফিন মিশিয়ে পরিবাহী পদার্থে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। (দ্য গার্ডিয়ান)

১৯.●আমাদের সৌরমন্ডল থেকে প্রায় এক হাজার আলোকবর্ষ দূরে একটি দুমুখো নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। ঐ নক্ষত্রের একদিকে রয়েছে হাইড্রোজেন আর অন্যদিকে হিলিয়াম। এই অদ্ভুত নক্ষত্রটিকে বিশদভাবে জানতে বিজ্ঞানীদের বিশেষ কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন ঐ নক্ষত্রের দুই দিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের তারতম্যের কারণে এমন ঘটনা ঘটছে। (দ্য গার্ডিয়ান)

২৪.● ৬০ থেকে ৮৫ বছর বয়স্ক প্রবীণদের উপর ওরোরান্ট ডিফিউজার পদ্ধতি প্রয়োগ করে ২২৬ শতাংশ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই পদ্ধতিতে এক বিশেষ ধরনের সুগন্ধি তেলের বাষ্প ব্যবহার করে অলফ্যাক্টরি বা ঘ্রানজ স্নায়ুকে উত্তেজিত করা হয়। এর ফলে স্মৃতি শক্তির উন্নতি ঘটে ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (ফ্রন্টিয়ারস ইন নিউরোসায়েন্স)

ঃ সংগঠন সংবাদ ঃ

হিরোশিমা-নাগাসাকি দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ৬ই অগাস্ট আমরা রাজ্যে বিভিন্ন ইউনিটের অঞ্চলে 'হিরোশিমা-নাগাসাকি' দিবসে পোস্টারিং কর্মসূচী গ্রহণ করি। সেখানে লেখা হয় 'যুদ্ধবাজের কাছে শান্তির প্রার্থনা, / অরণ্যে কান্না। / শোষণ মুক্তি ছাড়া / শান্তি আসে না'

এছাড়া 'পরমাণু শক্তি নয় গণ সংহার / সমাজ বিকাশে তার চাই ব্যবহার।' এই দুইটি পোস্টার আমরা বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটে, সোনারপুর ইউনিটে, পুরুলিয়া ইউনিটে, পাথর প্রতিমা ইউনিটে করি। বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটের পক্ষ থেকে ৬ই অগাস্ট আমরা সখের বাজার চন্ডীমন্ডপের মাঠের সংলগ্ন 'সোনার তরী' সভাগৃহে বিকেল ৪টা থেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করি। এই দিনের আলোচনা সভার শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত 'শঙ্খচীল' দিয়ে শুরু হয়। তারপর সঞ্চালক আলোচক প্রতিনিধিদের মঞ্চে ডেকে নেন। যদিও সঞ্চালক বলেছিলেন যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্যের শেষে উপস্থিত দর্শকরা মতামত রাখুন, আমরা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ই এবং ৯ই অগাস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে সামনে রেখে পরমাণু গবেষণার শুরু থেকে বোমা তৈরি পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করি।

সদস্যদের বক্তব্যের শেষে উপস্থিত বক্তারা অনেকেই বক্তব্য রাখেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শুধু হিরোশিমা নয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রাষ্ট্রের উদ্যোগে নারকীয় গণহত্যা, যুদ্ধে সাধারণ মানুষের মৃত্যু ইত্যাদিতে পুঁজিপতিশ্রেণীকেই দায়ী করেন। একজন বক্তার বক্তব্যে সাম্প্রতিক 'ওপেনহাইমার' চলচ্চিত্রটির প্রসঙ্গ উঠে আসে। অনুষ্ঠানের শেষে বাদল সরকারের 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকটির কিছু অংশ শ্রুতি নাটকরূপে পেশ করে স্থানীয় একটি কোচিং-এর ছাত্রছাত্রীরা। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত সকল দর্শকদের নাড়িয়ে দেয়।

৬ই অগাস্টের মতো ৯ই অগাস্ট আমাদের পুরুলিয়া ইউনিট নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের দিন পথ সভা করেছে। এই পথ সভা করা হয় শহরের শ্রমজীবী প্রধান এলাকায়। স্লোগান ওঠে – 'সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন।' ■

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে ক্যুইজ কনটেস্ট

আমাদের গোচরণ ইউনিটের পরিচালনায় দক্ষিন ২৪ পরগণার দেওয়ানগঞ্জ এ. কে. উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে ৬টা একটি ক্যুইজ কনটেস্টের আয়োজন করা হয়। এতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বিভিন্ন সংবাদ তুলে ধরা হয়। ক্যুইজ কন্টেস্টের পাশাপাশি স্বাধীনতার গান যেমন 'মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি' পরিবেশন করা হয়। ■

বড়িষা হাইস্কুলে শিশু ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ

বেহালা ঠাকুরপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ঐ দিনের পুলিশের ভূমিকার সমালোচনায় স্কুলের দেওয়ালে পরদিন স্কুল চলাকালীন অভিভাবকদের উপস্থিতিতে প্রতিবাদী পোস্টার করা হয়। ■

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন

গত বছরের মতো ২০শে অগাস্ট আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে দুপুর ১টায় জড়ো হয়ে এই দিবস উদ্‌যাপন করি। এই অনুষ্ঠানের আগে শতাধিক মানুষের মিছিল হয় সোনারপুর স্টেশন থেকে স্কুল পর্যন্ত। এদিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল শহীদ নরেন্দ্র দাভোলকরকে স্মরণ, উদ্বোধনী সঙ্গীত, পাথর-প্রতিমা ও বেহালা ইউনিটের পক্ষ থেকে কুসংস্কার বিরোধী গান, নাচ, কাকদ্বীপের সাথীর মডেল প্রদর্শনী, কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান, শ্রুতি নাটক, সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনার প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ এবং সর্বোপরি আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল – বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে বাধা কোথায়? মোট আট জন বক্তা বক্তব্য রাখেন। এদিনের অনুষ্ঠানটা সময় সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় শেষের দিকে অনেক দর্শক চলে যান।

এদিনের মঞ্চসজ্জা, হল ডেকোরেশন করা হয় বিভিন্ন দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে, আমাদের গোচরণ ইউনিট এই কাজটি সুন্দরভাবে করেছে। ■

ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতা ও কুসংস্কার বিরোধী সভা

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, দার্জিলিঙ জেলার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া হিন্দি হাইস্কুলে বিজ্ঞান মনস্ক'র শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতামূলক স্লাইড শো প্রদর্শন এবং অলৌকিকত্ব ও কুসংস্কার বিরোধী একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ডেঙ্গু রোগ সম্পর্কে স্লাইড শো হয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দুটি ভাগে। প্রথমভাগে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এবং পরে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের

নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। ডেঙ্গু রোগটি কি, কিভাবে তা মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, রোগের চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধের উপায় নিয়ে চর্চা হয়। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জীবন্ত আলোচনায় ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেয়। এরপর স্কুলের খোলা মাঠে সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে অলৌকিকত্ব ও কুসংস্কার বিরোধী একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সংগঠনের প্রতিনিধি বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তুলে ধরেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির সুফল সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য যাতে হয় তার জন্য চলমান বিজ্ঞান আন্দোলনে সকলকে সাথী হবার আহ্বান জানান। হিমালয় পর্বতমালার কোলে চা-বাগান অধ্যুষিত তরাই অঞ্চলের মনোরম পরিবেশে শত শত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সকলকে উজ্জীবিত করেছে।

(পরের অংশ ৫ পাতায়)

জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবসে নেওয়া নিন্দা প্রস্তাব

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবসে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের লক্ষ্যে সকল জনসাধারণের কাছে সাম্প্রতিকালে ঘটা ঘটনাগুলি সম্পর্কে এক নিন্দা প্রস্তাব আপনাদের সামনে পেশ করছে। এগুলি হল –

১. সি. বি. এস. ই সিলেবাসে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম থেকে ডারউইনবাদকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জীবন বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে যেমন ডারউইনবাদকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, তেমনি রসায়ন বিজ্ঞানের সিলেবাস থেকেও অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যায় সারণীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এভাবেই বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলি বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং দেশের প্রগতিশীল সমাজ প্রতিবাদে নেমেছেন। সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস টিঁকিয়ে রাখার এই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

২. কয়েকমাস আগে দেশের রাজধানী দিল্লী সংলগ্ন অঞ্চলে মহিলা কুস্তিগীরদের উপর যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে যে আন্দোলন চলেছে, বিজ্ঞান মনস্ক তাকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান দিচ্ছে, অন্যদিকে কুস্তিগীরদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তথা বাহুবলী সাংসদ ব্রিজভূষণ স্মরণ সিং ও তার চেলাচামুন্ডারা দেশের মহিলা কুস্তিগীরদের উপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে বীরদর্পে।

দেশের মহিলা কুস্তিগীররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামলে রাষ্ট্রশক্তি বলপূর্বক তাদের দমন করেছে। প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা তথা সরকার নির্লজ্জভাবে এই যৌন নিপীড়ণকারীদের পক্ষ নিয়েছে।

শুধু মহিলা কুস্তিগীর নয় খেলাধূলা – বিনোদন ক্ষেত্রসহ সকল শ্রমের বাজারে শ্রমজীবী নারীদের নির্যাতন এবং হয়রানি এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরের সব রকম নারী নির্যাতনকে বিজ্ঞান মনস্ক নিন্দা জানায় এবং এর অবসানের লক্ষ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ায়।

৩. সম্প্রতি কলকাতার বড়িষা হাইস্কুলে শিশু ছাত্রের দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে সকল জনগণের মতো আমরাও গভীর শোকাহত। দুর্ঘটনার পর কলকাতা কর্পোরেশনের লরিটিকে না আটকে ছেড়ে দেওয়ায় এবং দূরবর্তী থানার এলাকাতেও তাকে না ধরায় স্কুলের শিক্ষক-অভিভাবকসহ এলাকাবাসী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের জন্য জনগণকে অভিযুক্ত করে থানায় পুলিশী নির্যাতন করা হয়। একটি শিশু ছাত্রের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রতিক্রিয়াকে এবং স্কুলের ভিতর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনাকে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ তীব্র ধিক্কার জানায়, যে শাসন ব্যবস্থা স্বজন হারানোর কান্নাকে বলপূর্বক দমন করে, আজকের সভা তাকে তীব্র নিন্দা জানায়।

৪. সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডু কদর্য র‍্যাগিং-এর শিকার হয়ে নগ্ন অবস্থায় মরিয়া হয়ে হোস্টেলের বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। এর কয়েকদিন আগে অন্ধ্রপ্রদেশের জেলার একটি হোস্টেলেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘকাল ধরে দেশের নামী-অনামী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এভাবে বহু ছাত্রছাত্রীরা শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এমন ভয়াবহ মৃত্যু না হলে এইসব পৈশাচিক নির্যাতনের কাহিনী চাপা পরে থাকতো।

নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব এবং পচন ধরা সমাজের ঘৃণ্য বর্বর সংস্কৃতির অংশ হিসেবে এই র‍্যাগিং চলছে। র‍্যাগিং চলবে ততদিন, যতদিন এই শোষণমূলক সমাজে 'সামাজিক ডারউইনবাদের' নামে প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় চলবে। এই র‍্যাগিং সমাজের ভাইয়ে ভাইয়ে সহযোগিতা নয়, কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। এই অসুস্থ বিকৃত সংস্কৃতিকে আমরা সর্বোতভাবে ধিক্কার জানাই।

৫. বিগত তিনমাসের অধিক সময় ধরে ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্য মণিপুরে রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণ মদতে স্থানীয় উপজাতি/জনজাতিদের মধ্যে জাতি দাঙ্গা নতুন করে চলছে। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ দ্বারা মেইতেই জনগোষ্ঠীকে তফশীলি উপজাতি (এসটি) স্বীকৃতি দানের নির্দেশকে কেন্দ্র করে পাহাড়ী এবং সমতলবাসীদের মধ্যে নতুন করে জাতিদাঙ্গা শুরু হয়। এই জাতিদাঙ্গায় সরকারি হিসাবেই দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছে। চরম অমানবিকভাবে মহিলাদের নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় প্যারেড করিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছে। এই জাতিদাঙ্গাকে বিজ্ঞান মনস্ক তীব্র ধিক্কার জানায়। ভাষা-বর্ণ-জাতিগত বিভাজন হল মিথ্যা। শ্রমজীবীর শ্রেণীসংগ্রামই এই জাতিদাঙ্গার প্রতিষেধক। ■

ছড়া ঃ

ব্যঞ্জন বর্ণের ছড়া

(দ্বিতীয় অংশ)

– তন্ময়

প

পড়াশোনা কর সবাই খুব মন দিয়ে
সুস্থ সমাজ গড় মানুষকে নিয়ে।

ফ

ফল কাটা পথে ঘাটে, রঙচঙে পানীয়
খেলে শরীরের ক্ষতি, সকলকে জানিও।

ব

বিপদে সবার পাশে সর্বদা থাকবে
সকলকে ভালোবাসায় মানবতা জাগবে।

ভ

ভিটামিনের অভাবে বাসা বাঁধে নানা রোগ
অপুষ্টি দূর করা আমাদের ব্রত হোক।

ম

মান, হুশ নিয়ে চলা মনুষ্যত্বই ধর্ম
মৌলবাদের বিরুদ্ধে মানবতা বর্ম।

য

যুক্তিকে সাথী কর, ভক্তিকে নয়
যুদ্ধের ময়দানে হবেই যে জয়।

র

রক্ত কয়েক ফোঁটা কর যদি দান
বাঁচাতে পারবে বহু মানুষের প্রাণ।

ল

লক্ষ লক্ষ জনতার জীবন যন্ত্রণা
লয় করতে হবে, লক্ষ্য ভুলো না।

শ

শিরদাঁড়া সোজা রেখে শির উঁচু করে
শোষকের শোষণ যন্ত্র ফেলব উপড়ে।

ষ

ষড়ঋতু জুড়ে চলা নানা ষড়যন্ত্র
উদঘাটনে সংগ্রাম হোক মূল মন্ত্র।

স

সাদা কালো উঁচু নিচু জাতি ধর্ম ভেদ
সমাজ থেকে সমূলে করব উচ্ছেদ।

হ

হিংসা, দ্বেষ, লোভ ভালো নয় মোটে
এসবের ফলে সমাজে হানাহানি ঘটে।

ড়

ঘড়ির সময় ধরে কাজ সারো তাড়াতাড়ি
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখো সকল ঘরবাড়ি।

ঢ়

রূঢ় ভাষা কটুক্তি করো না কারও প্রতি
দৃঢ়ভাবে রুখে দাও অসভ্য সংস্কৃতি।

য়

জয় যদি পেতে চাও, ভয় নয় মোটে
ঝড় তোলো রাস্তায় পায় পায় হেঁটে।

ৎ

সৎ পথে চলা উচিত, সততাই মূলধন
অসৎ পথ পরিহার করে চল আজীবন।

ং

বাংলা ভাষা মাতৃভাষা, সকলে ভালোবাসি
প্রাদেশিকতার পুষ্ট জলে কেউ যেন না ভাসি।

ঃ

দুঃখ দুর্দশা ঘুচে কাটবে দুঃসময়
দুঃসাহসী লড়াইয়ে জেতা দুঃসাধ্য নয়।

ঁ

হাঁক দাও জোরসে, আঁখি দাও খুলিয়ে
খুঁজি চল সত্য, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: SO197407 of 2012-13

সোনারপুরে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আলোচনা সভা

সোনারপুরে জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবসে মিছিল

স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে কুইজ কন্টেস্ট, গোচরণ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

হিরোশিমা দিবস পালন, বেহালা, কলকাতা

দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি থানার এলাকার
বেলগাচিয়া হিন্দি হাই স্কুলের স্লাইড শো

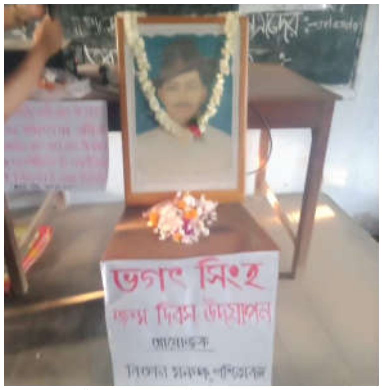

ভগৎ সিং-এর জন্মদিবস পালন, হাওড়া

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে
কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.com